

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যগুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি অষ্টম শ্রেণি

রচনা
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
মিলন রায়

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. হায়াৎ মামুদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

| প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত |

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্ক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে অষ্টম শ্রেণির জন্য রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মবজ্জ্বলের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলগুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বালানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	ভাষা	১
১.২	মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা	২
১.৩	সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য	৩
২.১	ধ্বনি ও বর্ণ	৯
২.২	ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ	১৪
৩.১	সন্ধি	১৬
৩.২	বিসর্গ সন্ধি	২১
৪.	শব্দ ও পদ	২৫
৪.১	লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ	২৬
৪.২	বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ	২৯
৪.৩	বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ	৩৩
৪.৪	নির্দেশক সর্বনামের রূপ	৩৬
৪.৫	ধাতু ও ক্রিয়াপদ	৩৮
৪.৬	সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া	৩৯
৪.৭	মৌলিক ও সাধিত ধাতু	৪০
৪.৮	ক্রিয়ার কাল	৪২
৫.	শব্দগঠন	৪৮
৫.১	ধন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদৈত	৪৮
৫.২	শব্দগঠন : প্রাথমিক ধারণা	৫২
৬.	বাক্য	৫৫
৬.১	বাক্যগঠনের শর্ত	৫৬
৬.২	খন্দ বাক্য, স্থায়ীন ও অস্থায়ী খন্দবাক্য	৫৭
৬.৩	সরল, জটিল ও যৌগিক বাকের গঠন	৫৮
৭.১	বিরামচিহ্ন	৬১
৭.২	ক্ষমা, সেমিক্ষেপন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার	৬২
৮.	বানান	৬৬
৮.১	বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম	৬৬
৯.	অভিধান	৭১

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৯.১	বর্ণানুক্রম	৭১
৯.২	ভুক্তি ও শীর্ষ শব্দ	৭২
১০.	শব্দার্থ	৭৪
১০.১	একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা	৭৪
১০.২	সমার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৮১
১০.৩	বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৮৭
১০.৪	বাগধারা	৮৮
	নির্মিতি ও অনুধাবন শক্তি	৯১
	সারাংশ ও সারমর্ম	৯৩
	ভাবসম্প্রসারণ	৯৭
	পত্র রচনা : ব্যক্তিগত পত্র	১০২
	আবেদন পত্র	১০৬
	নিম্নলিখিত পত্র	১১০
	প্রবন্ধ রচনা	
৫.১	বাংলাদেশের ষড়ঝাতু	১১২
৫.২	বাংলা নববর্ষ	১১৪
৫.৩	বিজয় দিবস	১১৫
৫.৪	ট্রেনে ভ্রমণ	১১৭
৫.৫	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	১১৯
৫.৬	আমার ছেলেবেলা	১২২
৫.৭	বাংলাদেশের কৃষক	১২৩
৫.৮	দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান	১২৫
৫.৯	ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১২৬
৫.১০	শ্রমের মর্যাদা	১২৮
৫.১১	পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা	১৩০
৫.১২	কর্মমুখী শিক্ষা	১৩১
৫.১৩	অধ্যবসায়	১৩৩
৫.১৪	স্বদেশ প্রেম	১৩৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাষা

- ১.১ ভাষা
- ১.২ মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা
- ১.৩ সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য
- ১.৪ কর্ম-অনুশীলন

১.১ ভাষা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার মনের মধ্যে সব সময়ই নানা বুদ্ধি বা ভাবের আনাগোনা চলে। সেই বুদ্ধি বা ভাব ইশারায়, নানা অঙ্গাভঙ্গি করে, ছবি ও নাচের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু মুখের ধ্বনির সাহায্যে ব্যাপক পরিসরে তা প্রকাশ করা যায়। যেভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করা হোক না কেন, এর সবই ভাষা। তবে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় মানুষের মুখের ধ্বনি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয় ও অন্যে বুঝতে পারে। সুতরাং সাধারণ কথায় ‘ভাষা’ বলতে বোঝায়, মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কর্তকগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টি। এই অর্থপূর্ণ ধ্বনিই হলো ভাষার প্রাণ।

ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: “মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্কাশন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাকেয় প্রযুক্তি, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।”

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জনসমাজের মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ দিয়ে অন্যের বোধগম্য অর্থপূর্ণ যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে তাকে ভাষা বলে।

স্থান, কাল ও সমাজভেদে ভাষার বৃপ্তভেদ দেখা যায়।

ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে। মানুষের গলনালি, দাঁত, মুখবিবর, কষ্ঠ, জিহ্বা, তালু, নাক ইত্যাদির সহযোগ হলো বাগ্যন্ত্র।

যেকোনো ধ্বনি বা আওয়াজই ভাষা নয়। সেখানে অর্থ এবং অর্থের ধারাবাহিকতা থাকা চাই। ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে গঠিত হয় শব্দ। আর একাধিক শব্দের সমন্বয়ে অর্থের ধারাবাহিকতায় তৈরি হয় বাক্য।

পশু-পাখির ডাক ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য এখানেই। মানুষ একের পর এক অর্থবোধক শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরি করে। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে একের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করে। এই ক্ষমতা পশু-পাখির মধ্যে নেই। পশু-পাখি নানা আওয়াজ করে ঠিকই, কিন্তু তা ভাষার ধৰনি, শব্দ ও বাক্যের মতো কোনো বিষয় বা ধারণাকে ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট করতে পারে না। সে জন্য পশু-পাখির ডাক ভাষা নয়।

স্থান, কাল ও সমাজভেদে ভাষার রূপভেদ হয় বলে পৃথিবীর সব দেশের সব জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা এক নয়। আবার একই ভাষার এক হাজার বছর আগের রূপ আর আজকের রূপ হুবহু মেলে না। যেমন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা বাংলা, ইঞ্জিনের মানুষের ভাষা ইংরেজি, ফ্রান্সের মানুষের ভাষা ফরাসি, চীন দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা ম্যান্ডারিন ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশে বাংলার পাশাপাশি চাকমা জনগোষ্ঠী নিজস্ব চাথ্মা ভাষায়, গরো জনগোষ্ঠী তাদের আচিক ভাষায় কথা বলে। পাঁচ শত বছর আগের বাংলা ভাষা এবং আজকের বাংলা ভাষাও হুবহু এক নয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে ভাষারূপের এই পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনশীলতার কারণে ভাষাকে প্রবহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা রকমের শব্দ ব্যবহার করা হয়। এগুলোই একেক দেশে একেক রকম ভাষার জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো ভাষাই স্থির থাকে না। ভাষা স্থির হয়ে গেলে তা মৃতভাষায় পরিণত হয়। পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি ভাষা প্রচলিত আছে।

১.২ মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা

ক. মাতৃভাষা :

মানুষ জন্মের পর সাধারণত প্রথমে তার মায়ের কাছে প্রতিপালিত হয়, তাই কথা শেখে। তাই জন্মলগ্ন থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ নিজের মায়ের কাছে যে-ভাষাটি শিক্ষা পায়, তাকেই তার ‘মাতৃভাষা’ বলে। এটি একটি ধারণার প্রকাশমাত্র। তাই যে শিশুর মা তার জন্ম-মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করে, সেই শিশু যখন বড় হয়, সে পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বড় হলেও তার মুখের সাধারণ ভাষাকে ‘মাতৃভাষাই’ বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর মায়ের কোলে এবং মায়ের বাংলা বোলে বড় হয়। বাঙালি মায়ের এই বুলি বাংলা। তাই বাঙালি জাতির মাতৃভাষা বাংলা। আবার বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বাস করে। তাদেরও পৃথক মাতৃভাষা আছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উত্তীর্ণা, বাড়ুখণ্ড রাজ্য; মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য ইত্যাদি স্থানে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এসব অঞ্চলে অনেকেই মাতৃভাষা বাংলা। তা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বহু দেশেই বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। সেসব স্থানেও বাংলা অনেকের মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষার বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ।

খ. রাষ্ট্রভাষা :

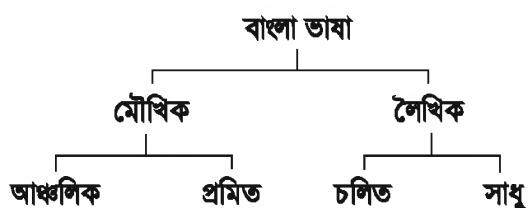
রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দেশের সংবিধানস্বীকৃত ভাষাকে ঐ দেশের রাষ্ট্রভাষা বলে। একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভাষার ব্যবহার থাকতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে বাংলা, চাঠমা, আচিক, মণিপুরী ভাষা ইত্যাদি; তারতে বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, কানাড়ি ভাষা ইত্যাদি; পাকিস্তানে পাঞ্জাবি, বালুচ, সিন্ধি ভাষা ইত্যাদি। এতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাজ কোন ভাষাতে পরিচালিত হবে— এই প্রশ্ন আসে। এ প্রশ্ন সমাধানকল্পে কোনো কোনো রাষ্ট্র নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের বোধগম্য ভাষা হিসেবে সাধারণত রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ ভাষায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড, যেমন : শিক্ষাপ্রদান, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সাহিত্যরচনা, সংবাদপত্র প্রকাশ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা, দলিল-দস্তাবেজ লিখন, রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পাশে ইংরেজিকেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানস্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা না থাকলেও দাপ্তরিক কাজকর্মের ভাষা হিসেবে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি স্বীকৃত। ভারতের রাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক কর্মে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ব্যবহার হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা বাংলা।

১.৩ সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একাধিক আলাদা রূপ আছে : একটি বলার ভাষা বা মৌখিক রূপ, অপরটি লেখার ভাষা বা লৈখিক রূপ। ভাষার মৌখিক রূপের আবার দুটো রীতি রয়েছে, যথা : আঞ্চলিক রীতি ও প্রমিত রীতি। অপর দিকে লৈখিক রূপেরও দুটো আলাদা রীতি আছে, যেমন : চলিত রীতি ও সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকার বা রীতি-ভেদ নিচের ছকের সাহায্যে দেখানো হলো :



আঞ্চলিক ভাষারীতি : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী মুখে মুখে যে ভাষারীতিতে মনোভাব ব্যক্ত করে সে ভাষারীতিই বাংলার ‘আঞ্চলিক ভাষারীতি’ নামে অভিহিত। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার প্রচলিত কথ্যরূপকেই আঞ্চলিক ভাষারীতি বলে।

যেমন— বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারীতি: ‘ওঁগপোয়া মাইন্ধ্যের দুয়া পোয়া আছিল।’ অর্থাৎ একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। আঞ্চলিক ভাষাকে উপভাষা বলে। আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের বহুবিচ্চি রূপ দেখা যায়। যেমন: ‘ছেলে’ শব্দটি অঞ্চলভেদে ছোয়াল, ছাওয়াল, ছাবাল, ছেইলে, পোলা, পোয়া, পুয়া, ব্যাটা, ব্যাডা, পুত, হুত ইত্যাদি উচ্চারিত হয়।

প্রমিত ভাষারীতি : বিভিন্ন ভাষারীতি কালক্রমে পরিমার্জিত হয়ে সবার গ্রহণযোগ্য একটি রূপ লাভ করে। এই ভাষারীতি সাধারণত শিক্ষিত লোকের কথাবার্তা ও নিত্য ব্যবহারে আরও আকর্ষণীয় হয়। ভাষাও যে শ্রমসাধ্য, প্রযত্নলব্ধ এবং শেখার কোনো বিষয়— প্রমিত ভাষারীতি তার প্রমাণ। এক কথায়, ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকেই প্রমিত ভাষারীতি বলে।

যেমন: ‘একজনের দুটো ছেলে ছিল।’

সাধু ভাষারীতি : যে ভাষারীতি অধিকতর গান্ধীর্ঘপূর্ণ, তৎসম শব্দবহুল, ক্রিয়াপদের রূপ প্রাচীনরীতি অনুসরী এবং আঞ্চলিকতামুক্ত তা-ই সাধু ভাষারীতি।

যেমন: ‘এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল।’

এই রীতি শুধু লিখিত গদ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

চলিত ভাষারীতি : ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহের মৌখিক ভাষারীতি মানুষের মুখে মুখে রূপান্তর লাভ করে প্রাদেশিক শব্দাবলি গ্রহণ এবং চমৎকার বাক্ভঙ্গির সহযোগে গড়ে উঠে। এই ভাষারীতিকেই চলিত ভাষারীতি বলে। এই রীতি মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয়।

যেমন: ‘একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল।’

সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

- ক. সাধু ভাষার রূপ অপরিবর্তনীয়। অঞ্চলভেদে বা কালক্রমে এর কোনো পরিবর্তন হয় না।
- খ. এ ভাষারীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলে। এর পদবিন্যাস সুনির্যন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- গ. সাধু ভাষারীতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এ ভাষায় এক প্রকার আভিজ্ঞাত্য ও গান্ধীর্ঘ আছে।
- ঘ. সাধু ভাষারীতি শুধু লেখায় ব্যবহার হয়। তাই কথাবার্তা, বক্তৃতা, ভাষণ ইত্যাদির উপযোগী নয়।
- ঙ. সাধু ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

- ক. চলিত ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য মার্জিত ও গতিশীল ভাষা। তাই এটি মানুষের কথাবার্তা ও লেখার ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এটি পরিবর্তনশীল।

- খ. এ ভাষারীতি ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়মকানুন দিয়ে সর্বদা ব্যাখ্যা করা যায় না।
- গ. চলিত ভাষারীতিতে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এটি বেশ সাবলীল, চটুল ও জীবন্ত।
- ঘ. বলার ও লেখার ভাষা বলেই এ ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ, নাটকের সংলাপ ও সামাজিক আলাপ-আলোচনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
- ঙ. চলিত ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির মধ্যে নানাদিক থেকে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। এ দুই ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য থেকেই তার ধারণা পাওয়া যায়। নিচে সাধু ও চলিত ভাষারীতির কয়েকটি পার্থক্য দেখানো হলো :

সাধু ভাষারীতি

১. সাধু ভাষারীতি সর্বজনগাত্রে লেখার ভাষা।
২. সাধু ভাষারীতি সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে।
৩. সাধু ভাষায় পদবিন্যাস রীতি সুনির্দিষ্ট।
৪. সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।
৫. সাধু ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।
৬. সাধু ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।
৭. সাধু ভাষা গুরুগান্তকীয়, দুর্বোধ্য ও মন্থর।
৮. সাধু ভাষারীতি অপরিবর্তনীয়, তাই কৃত্রিম।

চলিত ভাষারীতি

১. চলিত ভাষারীতি সর্বজনবোধ্য মুখের ও লেখার ভাষা।
২. চলিত ভাষা সব সময় ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম মেনে চলে না।
৩. চলিত ভাষায় পদবিন্যাস রীতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়।
৪. চলিত ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম।
৫. চলিত ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী।
৬. চলিত ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।
৭. চলিত ভাষা চটুল, সরল ও সাবলীল।
৮. চলিত ভাষারীতি পরিবর্তনশীল, তাই জীবন্ত।

নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য দেখা যায়। যথা :

১. বিশেষ্যপদের রূপে
২. সর্বনামপদের রূপে
৩. ক্রিয়াপদের রূপে
৪. অব্যয়পদের রূপে

১. বিশেষ্যপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
আগ্নি	আগুন
কর্ণ	কান
চন্দ্ৰ	চাঁদ
দণ্ড	দাঁত
পক্ষী	পাখি
ব্যাঘ	বাঘ
মৎস্য	মাছ
হস্তী	হাতি

২. সর্বনামপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
এই	এ
ইহা	এ
ইহাকে	একে
ইহাদের	এদের
উহা	ও
উহাদিগের	ওদের
কাহাকে	কাকে
কেহ	কেউ
তাহা	তা
তাহার	তার
যাহা	যা
যাহাদের	যাদের

৩. ক্রিয়াপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
আসিয়া	এসে
করিয়া	করে
করিয়াছে	করেছে
খাইতেছিল	খাচ্ছিল
গিয়াছিল	গেছিল
ঘূমাইতেছে	ঘূমাচ্ছে
চলিল	চলল
চাহিয়া	চেয়ে
জ্বালাইয়া	জ্বেলে
ডাকিতেছে	ডাকচে
নির্দ্রা যাওয়া	ঘূমানো
পড়িব	পড়ব
পার হইয়া	পেরিয়ে
ফুটিয়া উঠিয়াছে	ফুটে উঠেছে
বলিয়াছিলেন	বলেছিলেন
বলিয়া	বলে
বলিতে থাকিবে	বলতে থাকবে
ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙ্গে যেতে লাগল
লম্ফ প্রদান করিল	লাফ দিল
শুনিল	শুনল
শুনিয়াছিল	শুনেছিল
শয়ন করিলেন	শুলেন
শ্রবণ করিলাম	শুনলাম

৪. অব্যয়পদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
অদ্য	আজ
অদ্যাপি	আজও
কদাচ	কখনো
তথাপি	তবুও
নচেৎ	নইলে
নতুবা	নইলে
প্রায়শ	প্রায়ই
যদ্যপি	যদিও

সাধু ও চলিত ভাষারীতির উদাহরণ

সাধু ভাষারীতি

“উপন্যাসের অনুরূপ কোনো বস্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ঝুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বঙিয়া নহে, পৃথিবীর কোনো দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।”

চলিত ভাষারীতি

“একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে লেজ নেড়ে তার জবাব দিলে,—কী জানি মানে তার কী!”

১.৪ কর্ম-অনুশীলন

- মানুষ ভাষার সাহায্যে মনের কী কী ভাব প্রকাশ করতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি কর।
- একজন ভাষাবিদের নাম উল্লেখ করে ভাষা সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা লেখ।
- ‘আমার কার্য আমি করিয়াছি। এক্ষণ তাহাদিগের ইচ্ছা হইলে আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবে।’
— এই রকম করে সাধু ভাষায় দশটি বাক্য তৈরি কর। তারপর সেগুলোকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করে দেখাও।
- তোমার পঠিত একটি গল্প থেকে বিভিন্ন পদের একটি তালিকা তৈরি কর। তারপর সেগুলোর সাধুরূপের সাহায্যে দশটি বাক্য রচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনি ও বর্ণ

২.১ ধ্বনি ও বর্ণ

২.২ ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ

২.৩ কর্ম-অনুশীলন

২.১ ধ্বনি ও বর্ণ

ক. ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোকে পৃথকভাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গে সাধারণত অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ধ্বনি তৈরি হয় বাগবন্ধের সাহায্যে। ধ্বনি তৈরিতে যেসব বাক্-প্রত্যক্ষ সহায়তা করে সেগুলো হলো— ফুসফুস, গলনালি, জিহ্বা, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। ফুসফুস থেকে বাতাস বাইরে আসার সময় মুখে নানা ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তবে সব ধ্বনিই সব ভাষা গ্রহণ করে না।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঙ্গনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও বাধা পায় না এবং যা অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেই সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

২. ব্যঙ্গনধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও না কোথাও বাধা পায় এবং যা স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঙ্গনধ্বনি বলে। ক , খ , গ , ঘ , প , স , ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলোকে প্রকৃষ্টভাবে শুতিযোগ্য করে উচ্চারণ করতে হলে স্বরধ্বনির আশ্রয় নিতে হয়। যেমন : (ক+অ=) ক; (গ+অ=) গ; (প+অ=) প ইত্যাদি।

খ. বর্ণ

ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃসৃত বায়ু থেকে সৃষ্টি, তাই এর কোনো আকার নেই। এগুলো মানুষ মুখে উচ্চারণ করে এবং কানে শোনে। ভাষা লিখে প্রকাশ করার সুবিধার্থে ধ্বনিগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে কিছু চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। এই চিহ্নের নাম বর্ণ। অর্থাৎ কোনো ভাষা লিখতে যেসব ধ্বনি-দ্যোতক সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে বর্ণ বলে। এই বর্ণসমূহের সমষ্টিই হলো বর্ণমালা।

বাংলা ধ্বনির মতো বর্ণও তাই দুপ্রকার : ১. স্বরবর্ণ, ২. ব্যঞ্জনবর্ণ।

১. স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। কিন্তু স্বরবর্ণ ১১টি। যথা : অ, আ, ই, ঔ, উ, ঝ, এ, ঐ, ঊ, ঔ।
২. ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। যথা :

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	ৱ	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	ঝ	ঞ	
ঁ	ঃ	ঁ	ঁ	

বর্ণমালা : কোনো ভাষা লিখতে যে ধ্বনি-দ্যোতক সংকেত বা চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয় তার সমষ্টিই হলো বর্ণমালা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বাংলা বর্ণমালা বলে।
বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের লিখিত রূপ দুটি : ১. পূর্ণরূপ ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ : বাংলা ভাষা লেখার সময় কোনো শব্দে স্বাধীনভাবে স্বরবর্ণ বসলে তার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

শব্দের প্রথমে : অনেক, আকাশ, ইলিশ, উকিল, ঝণ, এক।

শব্দের মধ্যে : বেদুইন, বাড়ল, পাটুলি, আবহাওয়া।

শব্দের শেষে : বই, বউ, যাও।

২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ : অ-ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলো ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ণরূপের বদলে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে। স্বরবর্ণের এ ধরনের সংক্ষিপ্তরূপকে ‘কার’ বলে। স্বরবর্ণের ‘কার’-চিহ্ন ১০টি। যথা :

- আ-কার (।) – মা, বাবা, ঢাকা।
- ই-কার (ি) – কিনি, চিনি, মিনি।
- ঈ-কার (ী) – শশী, সীমানা, রীতি।
- উ-কার (ু) – কুকুর, পুকুর, দুপুর।
- উ-কার (ু) – ভূত, মূল্য, সূচি।
- ঝ-কার (্) – কৃষক, তৃণ, পৃথিবী।
- এ-কার (ে) – চেয়ার, টেবিল, মেয়ে।
- ঐ-কার (ৈ) – তৈরি, বৈরী, নৈর্ধূত।
- ও-কার (ো) – খোকা, পোকা, বোকা।
- ও-কার (ৌ) – নৌকা, মৌসুমি, পৌষ।

বাঙ্গা বর্ণমালায় ব্যঙ্গনবর্ণেরও দুটি শিথিত রূপ রয়েছে : ১. পূর্ণরূপ ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. ব্যঙ্গনবর্ণের পূর্ণরূপ : ব্যঙ্গনবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের প্রথমে, মধ্যে বা শেষে স্বাধীনভাবে বসে।

শব্দের প্রথমে : কবিতা, পড়াশোনা, টগর।

শব্দের মধ্যে : কাকলি, খুজনা, ফুটবল।

শব্দের শেষে : আম, শীতল, সিলেট।

২. ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ : অনেক সময় স্বরবর্ণ বা ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঙ্গনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঙ্গনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘ফলা’ বলে। ব্যঙ্গনবর্ণের ‘ফলা’-চিহ্ন ৬টি। যথা :

- ন / ণ-ফলা (ন / ণ) – চিহ্ন, বিভিন্ন, যত্ন; / পুর্বাত্ম, অপরাত্ম।
- ব-ফলা (ব) – পক্ষ, বিশ্ব, ধ্বনি।
- ম-ফলা (ম) – পদ্মা, মুহূর্মদ, তন্মায়।
- ঘ-ফলা (জ) – খ্যাতি, ট্যাত্রা, ব্যাংক।
- র-ফলা (র) – ক্রয়, গ্রহ। রেফ (՚) – কর্ক, বর্ণ।
- ল-ফলা (ল) – ক্লান্ত, গ্লাস, অয়ান।

বাংলা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত ।

বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণস্থান অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর নাম নিচের ছকে দেখানো হলো :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কঠ বা জিহ্বামূল	কঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, ষ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ড, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঝ, ট, ঠ, ড, চ, ণ, র, ডঢ়, ঢ়, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
এ, ঐ	কঠ ও তালু	কঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কঠ ও ওষ্ঠ	কঠোষ্ঠ্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ

বর্ণের উচ্চারণ প্রকৃতি

অ : অ-এর উচ্চারণ দু রকম :

স্থানাধিক (অ-এর মতো) : অজ (অজো), অকাল (অকাল), কথা (কথা), শপথ (শপথ) ,
ক্ষণ (খন), জঞ্জল (জন্জল), গয়না (গয়না), ঘর (ঘর)।

সংবৃত (ও-এর মতো) : অতি (ওতি), নদী (নোদি), অভিধান (ওভিধান), অতনু (অতোনু),
সুমতি (সুমোতি), মৌন (মৌনো), মৃগ (মৃগো)।

আ : আ-এর উচ্চারণও দু রকম :

স্থানাধিক (আ-এর মতো) : আগামী (আগামি), আমরা (আমূরা), আশা (আশা), আকাশ
(আকাশ), আলো (আলো)।

সংবৃত (অ্যা-এর মতো) : জ্বান (গ্যান), বিখ্যাত (বিক্খ্যাতে)।

ଏ : ଏ-ଏର ଦୂରକମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ :

ସ୍ଵାଭାବିକ (ଏ-ଏର ମତୋ) : ଏକଟି (ଏକ୍ଟି), କେକ (କେକ୍), କେଟଲି (କେଟ୍ଲି), ମେଯେ (ମେୟେ),
ବେଗୁନ (ବେଗୁନ୍), ମେଷ (ମେଶ୍)।

ସଂବୃତ (ଅୟ-ଏର ମତୋ) : ଏକ (ଅୟକ୍), ଖେଳା (ଖ୍ୟାଳା), ବେଳା (ବ୍ୟାଳା), କେନ (କ୍ୟାନୋ),
ଯେନ (ଯ୍ୟାନୋ)।

ଓ : ଓ ଏବଂ ୧ (ଅନୁସାର)–ଏର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଂହ ହୁଏ :

ବ୍ୟାଙ୍ଗ (ବ୍ୟାଥ୍), ବାଞ୍ଛାଲି (ବାଞ୍ଜାଲି), ବର୍ଜିମ (ବର୍ଧିମ୍), ରଙ୍ଗ (ରଥ୍)।

ଏୟ : ଏୟ-ଏର ଉଚ୍ଚାରଣ ତିଳ ରକମ ହୁଏ :

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏୟ : ଇଈ-ଏର ମତୋ : ମିଏୟ (ମିଯୋ), ମିଏଣ୍ (ମିଯା)।

ୟୁକ୍ତ ଏୟ + ଚ/ଛ/ଜ/ଝ : ନ-ଏର ମତୋ : ଅଥଳ (ଅନ୍ତଳ୍), ବାଞ୍ଛା (ବାନ୍ତା), ବ୍ୟଞ୍ଜନ (ବ୍ୟାନ୍ତଜୋନ୍),
ବାଞ୍ଛା (ବାନ୍ତା)।

ୟୁକ୍ତ ଜ + ଏୟ : ଗୀବା ଗ୍ରୀ-ଏର ମତୋ : ଜାନ (ଗୀଯାନ୍), ଯଜ୍ଞ (ଜୋଗ୍ଗୋଣ୍)।

ଶ, ସ, ସ : ଏଗୁଲୋର କହେକ ରକମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ :

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ-ଏର ମତୋ : ଶକ୍ତି (ଶୋକ୍ତି), ମଶା (ମଶା), ଶାସନ (ଶାଶୋନ), ସଚିବ (ଶୋଚିବ୍),
ସାହିତ୍ୟ (ଶାହିତ୍ତୋ), ଶୀଡ୍ (ଶୌଡ୍), ସର୍ଷ (ଶର୍ଷଠୋ)।

ୟୁକ୍ତ ଶ + ଚ/ଛ : ଶ-ଏର ମତୋ : ନିଶ୍ଚଯ (ନିଶ୍ଚୟ), ଶିରକ୍ଷେଦ (ଶିରୋଶକ୍ଷେଦେ)।

ୟୁକ୍ତ ଶ + ନ/ର : ଇଂରେଜି ଶ-ଏର ମତୋ : ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରୋସ୍ନୋ), ଶ୍ରମ (ପ୍ରୋମ୍)।

ୟୁକ୍ତ ଶ + ଝ/ଲ : ଇଂରେଜି ଶ-ଏର ମତୋ : ଶ୍ରଗାଳ (ସ୍ରଗାଳ୍), ଶ୍ଲୋକ (ପ୍ଲୋକ୍)।

ୟୁକ୍ତ ଶ + ବ/ମ/ସ : ଶଦେର ପ୍ରଥମେ ଶ/ଶୀ : ଶ୍ଵାସ (ଶ୍ଵାଶ୍), ଶ୍ଵେତ (ଶ୍ଵେତ୍), ଶାଶାନ (ଶୀଶାନ୍),
ଶାଶ୍ରୁ (ଶୌଶ୍ରୁ)।

ଶଦେର ମଧ୍ୟେ/ଶେଷେ ଶ୍ର୍ଷ : ନିଃଶ୍ଵାସ (ନିଶ୍ଵାଶ୍), ବିଶ୍ଵ (ବିଶ୍ଵୋ), ରଶି
(ରୋଶିଶ୍), ଦୃଶ୍ୟ (ଦୃଶ୍ବୋ)।

ୟୁକ୍ତ ସ + ଟ/ଠ : ଶ-ଏର ମତୋ : ମିଷ୍ଟାନ୍ (ମିଷ୍ଟାନ୍ନୋ), ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଅନୁଷ୍ଠାନ୍), ସର୍ଷୀ (ଶୋର୍ଷଠୀ)।

ୟୁକ୍ତ ସ + ତ/ଥ : ଇଂରେଜି ସ-ଏର ମତୋ : ନିସ୍ତାର (ନିସ୍ତାର୍), ଦୁସ୍ଥ (ଦୁସ୍ଥୋ)।

ୟୁକ୍ତ ସ + ନ/ର : ଶଦେର ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜି ସ : ସ୍ନାନ (ସ୍ନାନ), ସ୍ନେହ (ସ୍ନେହୋ), ସ୍ରଫ୍ତା (ପ୍ରୋଶ୍ଟା),
ସ୍ରୋତ (ପ୍ରୋତ୍)।

ଶଦେର ମଧ୍ୟେ/ଶେଷେ ସ୍ସ : ସ୍ନେହ (ଶ୍ସ୍ନେହୋ)।

যুক্ত স + ব/ম : শব্দের প্রথমে শ/শঁ : স্বর্ণ (শর্মনো), অরণ (শর্মোন)।
 শব্দের মধ্যে/শেষে শশ/স্স : সর্বস্ব (শর্ববোশ্শো), সুস্মিত (শুশ্মিতো)।

২.১ ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ

ম-ফলার উচ্চারণ

ক. পদের প্রথমে ম-ফলা থাকলে সে বর্ণের উচ্চারণে কিছুটা ঝোক পড়ে এবং সামান্য নাসিক্যম্বর হয়। যেমন : শুশান (শঁশান), অরণ (শঁরোন)।
 কখনো কখনো ‘ম’ অনুচ্চারিত থাকতেও পারে। যেমন : মৃতি (সৃতি বা সঁতি)।

খ. পদের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের দিক্ষি হয় এবং সামান্য নাসিক্যম্বর হয়।
 যেমন : আত্মীয় (আত্মিয়ো), পদ্ম (পদ্মো), বিশ্বয় (বিশ্বীয়), ভদ্রস্তুপ (ভশ্বোস্তুপ), ভদ্র (ভশ্বো), রশ্মি (রোশ্বী)।

গ. গ, ঙ, ট, ণ, ন বা ল বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে, ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : বাগী (বাগ্মি), মূন্দয় (মূন্ময়), জন্ম (জন্মো), গুল্ম (গুল্মো)।

ব-ফলার উচ্চারণ

ক. শব্দের প্রথমে ব-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে শুধু সে বর্ণের উপর অতিরিক্ত ঝোক পড়ে।
 যেমন : কুচিং (কোচিং), দিত্তি (দিত্তো), খাস (শাশ), সজন (শজোন), দম্প (দল্মো)।

খ. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে যুক্ত ব্যঞ্জনটির দিক্ষি উচ্চারণ হয়। যেমন : বিশ্বাস (বিশ্বাশ), পক্ষ (পক্ষো), অশ্ব (অশ্বো), বিষ্ণু (বিল্লো)।

গ. সন্ধিজ্ঞাত শব্দে যুক্ত ব-ফলায় ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন : দিঘিজয় (দিগ্বিজয়), দিঘুলয় (দিগ্বুলয়)।

ঘ. শব্দের মধ্যে বা শেষে ‘ব’ বা ‘ম’-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে।
 যেমন : তিব্বত (তিব্বত). লম্ব (লম্বো)।

ঙ. উৎ উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন : উদ্বাস্তু (উদ্বাস্তু), উদ্বেল (উদ্বেল)।

২.৩ কৰ্ম-অনুশীলন

১. তোমার দুই কম্পুর আলাপ মন দিয়ে শোন। তারপর তাদের যে উচ্চারণগুলো তোমার কাছে অশুল্দ্য মনে হয় তা খাতায় লিখে তোমার শিক্ষককে দেখিয়ে নিজেকে যাচাই কর।
২. ব-ফলাযুক্ত বানানে ব-এর উচ্চারণ কখন বহাল থাকে? সূত্রসহ ১০টি শব্দ লেখ।
৩. “একদিন বিকেলে হস্তদণ্ড সাবু বাড়ির উঠান থেকে ‘মা মা’ বলে চিংকার করতে করতে ঘরে ঢুকল। চিংকার শুনে জৈতুন বিবি হকচিয়ে ওঠেন। তিনি রান্নাঘরে ছিলেন। দ্রুত পাকশালা থেকে বেরিয়ে এসে সাবুকে জিজ্ঞেস করেন: ‘কী রে— ? এত চিকির পাড়সৃ ক্যান?’”
 — উদ্ধৃতাংশে যেসব ‘কার’-এর ব্যবহার আছে, সেগুলোর ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত কর।
 — ‘কার’গুলোর প্রত্যেকটি দিয়ে দুটো নতুন শব্দ তৈরি কর।
৪. “শাশানে পৌছে শশুরমশাইয়ের শৈশবের স্মৃতি অরণ হলো। গিয়েছিলেন বিশ্঵নাথবাবুর সৎকার সম্পন্ন করতে পঞ্চা নদীর পাড়ে। ফিরে এলেন ভস্মাবৃত হয়ে, শাশু মুক্তন করে।”
 — এখানে কোন কোন ‘ফলা’ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ কর।
 — উদ্ধৃতাংশ অবলম্বনে ‘শাশান’, ‘শশুর’, ‘অরণ’, ‘সম্পন্ন’, ‘শাশু’ শব্দাবলির উচ্চারণ লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি

৩.১ সন্ধি

৩.২ বিসর্গ সন্ধি

৩.৩ কর্ম-অনুশীলন

৩.১ সন্ধি

মানুষ কথা বলার সময় কথার গতি বৃদ্ধি পায়। দুট কথা বলার সময় কখনো কখনো দুটো শব্দের কাছাকাছি থাকা দুটো ধ্বনির উচ্চারণ একত্রিত হয়ে যায়। ব্যাকরণে একে সন্ধি বলা হয়। যেমন: ‘আমি বিদ্যা আলয়ে যাব।’ বাক্যটি বলার সময় ‘আমি বিদ্যালয়ে যাব’ হয়ে যায়। এখানে ‘বিদ্যা’-এর ‘আ’-ধ্বনি এবং ‘আলয়’-এর ‘আ’-ধ্বনি মিলে গেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন : দুটি বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্তী হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য উভয়ের মিলন হয়ে এক বর্ণ বা একের রূপান্তর বা একের লোপ বা উভয়ের রূপান্তর হলে— এরূপ মিলনকে সন্ধি বলে।

এই সংজ্ঞার আলোকে বলা চলে : পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনির মিলনের ফলে যদি এক ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তবে তাকে সন্ধি বলে।

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। দুটো ধ্বনির সন্ধিতে প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি এবং পরের শব্দের প্রথম ধ্বনির মিলন ঘটে। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। কথা বলার সময় শব্দের উচ্চারণ সহজ হয়। ভাষা সংক্ষিপ্ত হয় এবং শুনতে ভালো লাগে।

সন্ধিতে ধ্বনির চার ধরনের মিলন হয় :

১. উভয় ধ্বনি মিলে একটি ধ্বনি হয়।
২. একটি ধ্বনি বদলে যায়।
৩. একটি ধ্বনি লোপ পায়।
৪. উভয় ধ্বনির বদলে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

বাংলা সন্ধি দু প্রকার : ১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন :

সোনা + আলি = সোনালি

বুপো + আলি = বুপালি

মিথ্যা + উক = মিথুক

কুড়ি + এক = কুড়িক

নদী + এর = নদীর

মা + এর = মায়ের

২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন :

কাঁচা + কলা = কাঁচকলা

নাতি + বৌ = নাতবৌ

ছেট + দা = ছোড়দা

উৎ + চারণ = উচ্চারণ

আর + না = আন্না

চার + টি = চাড়ি

বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়া ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। এসব তৎসম শব্দের সন্ধি সংস্কৃতের নিয়মেই হয়। তাই সংস্কৃতের নিয়ম মেনে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের সন্ধি ৩ প্রকার। যথা : ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জনসন্ধি ৩. বিসর্গসন্ধি

ক. স্বরসন্ধি : সহজ সূত্র ও উদাহরণ

১. অ, আ ধ্বনির সন্ধি

সূত্র	উদাহরণ	
অ + অ = আ (↑)	নব + অন্ন = নবান্ন	পরম + অণু = পরমাণু
অ + আ = আ (↑)	জল + আশয় = জলাশয়	পাঠ + আগার = পাঠাগার
আ + অ = আ (↑)	কথা + অমৃত = কথামৃত	আশা + অতীত = আশাতীত
আ + আ = আ (↑)	বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	মহা + আশয় = মহাশয়

২. ই, ঈ ধ্বনির সন্ধি

ই + ই = ঈ (ী)	অতি + ইত = অতীত	রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ই + ঈ = ঈ (ী)	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
ঈ + ই = ঈ (ী)	শচী + ইন্দ্র = শচিন্দ্র	মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ (ী)	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ	পৃথিবী + ঈশ্বর = পৃথিবীশ্বর

৩. উ, উ ধ্বনির সন্ধি

উ + উ = উ (্)	কাটু + উক্তি = কটৃক্তি	মরু + উদ্যান = মরুদ্যান
উ + উ = উ (্)	লঘু + উর্মি = লঘূর্মি	বহু + উর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব

উ + উ = উ (্)

উ + উ = উ (্)

২. অ/আ, ই/ঈ ধ্বনির সম্মিলন

অ/আ + ই/ঈ = এ (ে)

বধু + উৎসব = বধূৎসব

ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব

বধু + উক্তি = বধূক্তি

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর

৩. অ/আ, উ/উ ধ্বনির সম্মিলন

অ/আ + উ/উ = ও (ো)

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়

চল + উর্মি = চলোর্মি

কথা + উপকথন = কথোপকথন

মহা + উর্মি = মহোর্মি

৪. অ/আ, খ/খি ধ্বনির সম্মিলন

অ/আ + খি = অর (’)

অ/আ + খত = আর

দেব + খমি = দেবর্মি

শীত + খত = শীতার্ত

রাজা + খমি = রাজর্মি

ক্ষুধা + খত = ক্ষুধার্ত

৫. অ/আ, এ/ঐ ধ্বনির সম্মিলন

অ/আ + এ/ঐ = ঐ (ৈ)

জন + এক = জনেক

মত + এক্য = মতৈক্য

তথা + এব = তথেব

মহা + এশ্বর্য = মহেশ্বর্য

৬. অ/আ, ও/ও ধ্বনির সম্মিলন

অ/আ + ও/ ও = ও (ৌ)

জল + ওকা = জলোকা

চিত্ত + ওদীর্য = চিত্তোদীর্য

মহা + ওষধি = মহোষধি

মহা + ওষধ = মহোষধ

৭. ই/ঈ-এর পর ভিন্ন ধ্বনির সম্মিলন

ই/ঈ + অ/আ = য (ঝ/ঝি)

অতি + অন্ত = অত্যন্ত

ইতি + আদি = ইত্যাদি

ই/ঈ + উ/উ = য (ঝ/ঝি)

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি

ই/ঈ + এ = য (ঝ)

প্রতি + এক = প্রত্যেক

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

মসী + আধার = মস্যাধার

প্রতি + উষ = প্রতুষ

৮. উ/উ-এর পর ভিন্ন ধ্বনির সম্মিলন

উ/উ + অ/আ = ব/বা

সু + অল্প = স্বল্প

উ/উ + ই/ঈ = বি/বী

অনু + ইত = অন্বিত

উ/উ + এ = বে

অনু + এষণ = অন্বেষণ

সু + আগত = স্বাগত

তনু + ঈ = তন্বী

৯. এ/ঐ-এর পর ভিন্ন ধ্বনির সম্পর্ক

এ/ঐ + অ/আ = অয়/আয় নে + অন = নয়ন

নে + অক = নায়ক

১০. ও/ও-এর পর ভিন্ন ধ্বনির সম্পর্ক

ও/ও + অ/আ = অব/আব	পো + অন = পবন
	লো + অন = লবণ
ও/ও + ই = অবি/আবি	পো + ইত্র = পবিত্র
ও/ও + উ = আবু	তো + উক = তাবুক
ও/ও + এ = অবে	গো + এষণা = গবেষণা

গো + আদি = গবাদি
পৌ + অক = পাবক
নৌ + ইক = নাবিক

খ. ব্যঞ্জনসম্পর্ক : পরিচিত সূত্র ও উদাহরণ

১. অরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পর্ক

অ + ছ = ছ	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ
আ + ছ = ছ	কথা + ছলে = কথাছলে
ই + ছ = ছ	পরি + ছদ = পরিছদ
উ + ছ = ছ	তরু + ছায়া = তরুছায়া

২. ব্যঞ্জনধ্বনি + অরধ্বনির সম্পর্ক

ক + অ = গ	দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
ট + আ = ড> ড়	ষট্ + আনন = ষড়ানন
ত + অ = দ	তৎ + অন্ত = তদন্ত
প + অ = ব	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পর্ক

ত + চ/ছ = চ/ছ	উৎ + চারণ = উচ্চারণ
দ + চ/ছ = চ/ছ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
ত + জ/ঝ = জ্জ/ঝ্জ	যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
দ + জ = জ্জ	বিপদ + জনক = বিপজ্জনক
ত + ড = ড্ড	উৎ + ডীন = উজ্জীবন
ত + ল = ল্ল	উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
ত + শ = ছ্ছ	চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি
ত + হ = ম্ম	তৎ + হিত = তদ্বিত
দ + হ = ম্ম	পদ + হতি = পদ্বতি

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া
কৃৎ + ঝটিকা = কুঞ্জটিকা

ক + দ = গু + দ	বাক্ + দান = বাগুদান
ক + ব = গু + ব	দিক্ + বিজয় = দিপ্তিজয়
ট + য = ড় >ড় + য	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
ত + গ = দ্ + গ	উৎ + গিরণ = উদ্গিরণ
ত + ঘ = দ্ + ঘ	উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন
ত + ব = দ্ + ব	উৎ + বস্থন = উদ্বস্থন
ত + ত = দ্ + ত	উৎ + তব = উঙ্গব
ত + র = দ্ + র	তৎ + বুপ = তদুপ
ক + ন = ঙ + ন	দিক্ + নির্ণয় = দিকনির্ণয়
ত + ম = ন + ম	তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে
ত + ন = ন্ন	উৎ + নতি = উন্নতি
ত + ম = ন্ম	তৎ + ময় = তন্ময়
ম + ক = ঙ/ঁ + ক	শম্ + কা = শঙ্কা
ম + খ = ঁ + খ	সম্ + খ্যা = সংখ্যা
ম + গ = ঁ + গ	সম্ + গীত = সংগীত
ম + ঘ = ঁ + ঘ	সম্ + ঘাত = সংঘাত
ম + চ = ঞও	সম্ + চয় = সংঘচয়
ম + ত = ঞ্ঞ	সম্ + তাপ = সন্তাপ
ম + দ = ম্দ	সম্ + দর্শন = সম্পর্শন
ম + ধ = ম্ধ	সম্ + ধান = সম্পৰ্ধান
ম + ন = ম্ন	কিম্ + নর = কিম্বুর
ম + য = ঁ + য	সম্ + যম = সংযম
ম + র = ঁ + র	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
ম + শ = ঁ + শ	সম্ + শয় = সংশয়
ম + হ = ঁ + হ	সম্ + হার = সংহার

৩.২ বিসর্গসম্মিলন

বিসর্গ (ঁ)—এর সঙ্গে অর্থবানি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সম্মিলন হয়, তাকে বিসর্গসম্মিলন বলে। উচ্চারণের দিক থেকে বিসর্গ দুরকম :

১. রঁ-জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে রঁ থাকলে উচ্চারণের সময় রঁ লোপ পায় এবং রঁ-এর জায়গায় বিসর্গ (ঁ) হয়। উচ্চারণে রঁ বজায় থাকে। যেমন : অন্তর > অন্তঃ + গত = অন্তর্গত (অন্তোর্গতো)।

২. সঁ-জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে সঁ থাকলে সম্মিলন সময় সঁ লোপ পায় এবং সঁ-এর জায়গায় বিসর্গ (ঁ) হয়। উচ্চারণে সঁ বজায় থাকে। যেমন : নমস্তু > নমঃ + কার = নমস্কার (নমোশ্কার)।

বিসর্গসম্মিলন দুভাবে সাধিত হয় :

১. বিসর্গ (ঁ) ও অর্থবানি মিলে
২. বিসর্গ (ঁ) ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে।

১. বিসর্গ ও অর্থবানির সম্মিলন

ক. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ-ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি স্থলে ও-কার হয়। যেমন :

ততঃ + অধিক = ততোধিক

যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ

বযঃ + অধিক = বয়োধিক

খ. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ, আ, উ-ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি মিলে রঁ হয়। যেমন :

পুনঃ + অধিকার = পুনরাধিকার

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ

পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি

পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনধ্বনির সম্মিলন

ক. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে বর্গের তয়/ ৪ৰ্ষ/ ৫মে ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি স্থলে রঁ-জাত বিসর্গের/ রেফ (‘) এবং স-জাত বিসর্গে ও-কার হয়। যেমন :

রঁ-জাত বিসর্গ : রঁ

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান

পুনঃ + বার = পুনর্বার

অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত

পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন

স-জাত বিসর্গ : ৪

- ক. মনঃ + গত = মনোগত
 তিরঃ + ধান = তিরোধান
 অধঃ + মুখ = অধোমুখ
 মনঃ + রম = মনোরম
 মনঃ + হর = মনোহর

- সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
 তপঃ + বন = তপোবন
 মনঃ + যোগ = মনোযোগ
 মনঃ + লোভা = মনোলোভা

খ. বিসর্গের পরে চ/ছ থাকলে বিসর্গের স্থলে শ; ট/ঠ থাকলে ষ এবং ত/ধ থাকলে স হয়। যেমন :

- নিঃ + চয় = নিচয়
 দুঃ + চরিত্র = দুচরিত্র
 ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার
 চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
 দুঃ + তর = দুষ্টর
 ইতঃ + তত = ইত্তত

- শিরঃ + ছেদ = শিরছেদ
 নিঃ + ছিদ্র = নিষিদ্র
 নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর
 নিঃ + তেজ = নিস্তেজ
 দুঃ + থ = দুষ্থ

গ. অ/আ ভিন্ন অন্য অরের সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অরধবনি, বর্ণের ওয় / ৪ৰ্থ / ৫ম ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ স্থলে র হয়। যেমন :

- নিঃ + অবধি = নিরবধি
 নিঃ + গত = নির্গত
 নিঃ + বাক = নির্বাক
 আবিঃ + ভাব = আবিৰ্ভাব
 দুঃ + অবস্থা = দুৱবস্থা
 দুঃ + গতি = দুৰ্গতি
 প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুৰ্ভাব
 দুঃ + যোগ = দুৰ্যোগ

- নিঃ + আপদ = নিৱাপদ
 নিঃ + ঘট্ট = নিৰ্ঘট্ট
 নিঃ + ভয় = নিৰ্ভয়
 আশীঃ + বাদ = আশীৰ্বাদ
 দুঃ + আচার = দুৱাচার
 দুঃ + বোধ = দুৰ্বোধ
 দুঃ + মর = দুৰ্মৰ
 দুঃ + লভ = দুৰ্লভ

ঘ. র-জ্ঞাত বিসর্গের পরে র থাকলে বিসর্গ লোগ পায় এবং প্রথম স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন :

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস = নীরস

নিঃ + রোগ = নীরোগ

ঙ. অ/আ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে স হয়। যেমন :

নমঃ + কার = নমস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

পুরঃ + কার = পুরস্কার

তাৎ + কর = ভাস্কর

চ. ই/উ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে ষ হয়। যেমন :

নিঃ + কাম = নিষ্কাম

নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

বহিঃ + কার = বহিষ্কার

চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

দৃঃ + পাচ্য = দৃষ্পাচ্য

ছ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্মিলিত বিসর্গ লোগ পায় না। যেমন :

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া

অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ

জ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিসর্গ লোগ পেলেও সম্মিলিত হয় না। যেমন :

অতঃ + এব = অতএব

বিসর্গ সম্মিলিত কিছু ব্যতিক্রম :

অহঃ + অহ = অহরহ

অহঃ + নিশা = অহর্নিশ

৩.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. সতী ইশ বাবু মাধ্যমিক বিদ্যা আলয়ের শিক্ষক। তার অহম কার নেই, তিনি সম্মুখীন ভালোবাসেন। – উদ্ধৃতাংশে মোটা দাগ দেয়া শব্দগুলোর সন্ধি কর। তোমার পছন্দমতো এ রকম আরও কয়েকটি শব্দের বাক্য লেখ।
২. তুমি আজ সারা দিন যাদের কথাবার্তা শুনেছ, সেসব কথার মধ্যে থেকে মনে করে ১০টি সন্ধিবন্ধ শব্দ বের কর। তারপর সেগুলোকে আলাদা করে কোন প্রকার সন্ধি তা লেখ। যেমন: তোমার বাবা বললেন, “দোকান থেকে পাশসের আলু, গোটা পাঁচেক কাঁচকলা আর এক কৌটা গব্য-ঘৃত নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। দেখ, যেন বেশকম না হয়।” – এখানে সন্ধিবন্ধ শব্দগুলো হচ্ছে—

পাশসের, পাঁচেক, কাঁচকলা, গব্য, বেশকম।

পাশসের = পাঁচ + সের = ব্যঙ্গনসন্ধি

পাঁচেক = পাঁচ + এক = ব্যঙ্গনসন্ধি

কাঁচকলা = কাঁচা + কলা = ব্যঙ্গনসন্ধি

গব্য = গো + য = ব্যঙ্গনসন্ধি

বেশকম = বেশি + কম = ব্যঙ্গনসন্ধি

৩. বহিষ্কার, আবিষ্কার, নমস্কার, পুরস্কার শব্দগুলো সন্ধির কোন নিয়ম মেনে গঠিত হয়েছে? নিয়মগুলো লেখ এবং সে নিয়ম অন্যায়ী তোমার পাঠ্য বই থেকে আরও কয়েকটি শব্দ খুঁজে নিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শব্দ ও পদ

৪. শব্দ ও পদ

- ৪.১ লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ
- ৪.২ বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ
- ৩.৩ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ : সংজ্ঞাবাচক, শ্রেণিবাচক, সমষ্টিবাচক, ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক
- ৪.৪ নির্দেশক সর্বনামের রূপ (চলিত রীতি) : ‘এ’, ‘ও’
- ৪.৫ ধাতু ও ক্রিয়াপদ
- ৪.৬ মৌলিক ও সাধিত ধাতু
- ৪.৭ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া
- ৪.৮ ক্রিয়ার কাল : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা
- ৪.৯ কর্ম-অনুশীলন

৪. শব্দ ও পদ

অর্থ হলো শব্দের প্রাণ। এক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলনে যদি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় তবে তাকে শব্দ বলে। যেমন : ক, ল, ম – এই তিনটি ধ্বনি একসাথে জুড়ে দিলে হয় : কলম (ক+ল+ম)। ‘কলম’ লেখার একটি উপকরণকে বোঝায়। সুতরাং এটি একটি শব্দ। এ রকম : আমি, বাজার, যাই ইত্যাদিও শব্দ। এগুলোর আলাদা আলাদা অর্থ আছে। কিন্তু এ রকম আলাদা আলাদা শব্দ মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। তাই অর্থপূর্ণ শব্দ জুড়ে জুড়ে মানুষ তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে থাকে। যেমন : ‘আমি বাজারে যাই।’ – এটি একটি বাক্য। এখানে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ যখন একত্রিত হয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে।

এবার লক্ষ করি : আমি, বাজার, যাই – তিনটি অর্থপূর্ণ শব্দ।

আমি বাজারে যাই – একটি মনের ভাব প্রকাশক বাক্য।

এখানে ‘বাজার’ শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হবার সময় কিছুটা (বাজার+এ) বদলে গেছে। বাক্যে ব্যবহৃত হবার সময় শব্দের শেষে এই ধরনের কিছু বর্ণ যোগ হয়। এগুলোকে বলে বিভক্তি। শব্দে বিভক্তি যুক্ত হলেই তাকে

পদ বলা হয়। তাহলে বলা যায়: বিভক্তি যুক্ত শব্দকে অথবা বাকে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। পদ পাঁচ প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. অব্যয় ও ৫. ক্রিয়া।

৪.১ লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ

লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো কোনোটি পুরুষ জাতীয়, কোনোটি স্ত্রী জাতীয়, কোনোটি আবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। তাই যেসব চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা শব্দকে পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য জাতীয় হিসেবে আলাদা করা যায়, তাকে লিঙ্গ বলে।

লিঙ্গ চার প্রকার। যথা :

১. পুঁথলিঙ্গ বা পুরুষবাচক শব্দ। যেমন : বাবা, ছেলে, বিদ্বান, সুন্দর।
২. স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীবাচক শব্দ। যেমন : মা, মেয়ে, বিদুষী, সুন্দরী।
৩. উভয়লিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন : মানুষ, শিশু, সত্ত্বান, বাঙালি।
৪. ক্লীবলিঙ্গ বা অলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন : বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল।

পুঁথলিঙ্গ বা পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তর করাকে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন বলে।
লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন :

১. পুরুষবাচক শব্দের শেষে -আ (১), -ঈ (২), -নী, -আনি, -ইনি ইত্যাদি স্ত্রীপ্রত্যয় জুড়ে পুঁথলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করা যায়। যেমন : প্রথম > প্রথমা, চাকর > চাকরানি, ছাত্র > ছাত্রী, জেলে > জেলেনি।
২. কখনো কখনো ভিন্ন শব্দযোগেও পুঁথলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলঙ্গবাচক শব্দে পরিবর্তন হয়। যেমন : বাবা > মা, ছেলে > মেয়ে, পুরুষ > নারী, সাহেব > বিবি, স্বামী > স্ত্রী, কর্তা > গিন্নি, ভাই > বোন, পুত্র > কন্যা, বর > কনে।
৩. শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ জুড়ে দিয়েও শব্দের লিঙ্গান্তর হয়ে থাকে। যেমন : পুরুষ-মানুষ > মেয়ে-মানুষ, হুলো বিড়াল > মেনি বিড়াল, মদ্দা ঘোড়া > মাদি ঘোড়া, ব্যাটাছেলে > মেমেছেলে, ঝঁড়ে বাচ্চুর > বকনা বাচ্চুর, বলদ গরু > গাই গরু।
৪. কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে মহিলা, নারী ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে শব্দের লিঙ্গান্তর হয়। যেমন : কবি > মহিলা কবি, ডাক্তার > মহিলা ডাক্তার, সভ্য > নারী সভ্য, সৈন্য > নারী সৈন্য।
৫. কোনো কোনো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুঁথলিঙ্গবাচক শব্দ স্ত্রীলঙ্গবাচক শব্দে পরিবর্তন হয়। যেমন : গয়লা > গয়লা বউ, বোন পো > বোন বি, ঠাকুর পো > ঠাকুর বি।

৬. কতকগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন : কবিরাজ, কৃতদার, অকৃতদার, বিপত্তীক, স্ত্রেণ।

৭. কতকগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন : সতীন, সৎমা, সধবা, এয়ো, দাই।

নিচে পুঁজিঙ্গা শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের কিছু নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. শব্দের শেষে ‘-আ’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
অজ	অজা	প্রিয়	প্রিয়া
আধুনিক	আধুনিকা	প্রবীণ	প্রবীণা
কোকিল	কোকিলা	বৃন্দ	বৃন্দা
চতুর	চতুরা	মাননীয়	মাননীয়া
চথ্পল	চথ্পলা	শিষ্য	শিষ্যা
নবীন	নবীনা	সরল	সরলা

২. শব্দের শেষে ‘আ’-এর জায়গায় ‘-ই’ প্রত্যয় বসিয়ে :

পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
কাকা	কাকি	বুড়া	বুড়ি
চাচা	চাচি	নানা	নানি
দাদা	দাদি	মামা	মামি

৩. শব্দের শেষে ‘-ই’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুঁজিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
কিশোর	কিশোরী	মানব	মানবী
ছাত্র	ছাত্রী	ময়ূর	ময়ূরী
তরুণ	তরুণী	রাক্ষস	রাক্ষসী
দাস	দাসী	সিংহ	সিংহী
নর	নরী	সুন্দর	সুন্দরী
পাত্র	পাত্রী	হরিণ	হরিণী

৪. শব্দের শেষে ‘-নি / -নী’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ
কামার	কামারনী	জেলে	জেলেনি
কুমার	কুমারনী	ধোপা	ধোপানী

৫. শব্দের শেষে ‘-আনি’ / ‘আনী’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ
চাকর	চাকরানি	মেথর	মেথরানি
ঠাকুর	ঠাকুরানি	নাপিত	নাপিতানি
অরণ্য	অরণ্যানী	হিম	হিমানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রানী	শুদ্ধ	শুদ্ধানী

৬. শব্দের শেষে ‘ইনী’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাঞ্চল	কাঞ্চলিনী	গোয়ালা	গোয়ালিনী
অনাথ	অনাথিনী	বাষ	বাষিনী
নাগ	নাগিনী	বিদেশি	বিদেশিনী
মানী	মানিনী	গুণী	গুণিনী
তপস্বী	তপস্বিনী	ধনী	ধনিনী
শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী	সুকেশ	সুকেশিনী

৭. শব্দের শেষে ‘-ইকা’ প্রত্যয় যোগ করে :

পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ
বালক	বালিকা	পাঠক	পাঠিকা
লেখক	লেখিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
গায়ক	গায়িকা	নায়ক	নায়িকা
সেবক	সেবিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা

৮. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ থাকলে ‘ত্রী’ হয় :

পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রীলিঙ্গ
নেতা	নেত্রী	কর্তা	কর্ত্রী
শ্রোতা	শ্রোত্রী	ধাতা	ধাত্রী

৯. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘অত’, ‘বান’, ‘মান’, ‘ইয়ান’ থাকলে ‘অতী’, ‘বতী’, ‘মতী’, ‘ইয়সী’ হয় :

পুরুষিজ্ঞা	স্ত্রীলিঙ্গিজ্ঞা	পুরুষিজ্ঞা	স্ত্রীলিঙ্গিজ্ঞা
সৎ	সতী	মহৎ	মহতী
গুণবান	গুণবতী	বৃপ্তবান	গুণবতী
শ্রীমান	শ্রীমতী	বৃদ্ধিমান	বৃদ্ধিমতী
গরীয়ান	গরীয়সী	মহীয়ান	মহীয়সী

৪.২ বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ

ব্যাকরণে বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা। তাই, যে শব্দ দিয়ে ব্যাকরণে কোনো কিছুর সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করা হয়, তাকে বচন বলে।

বাংলা ভাষায় বচন দু প্রকার। যথা : ১. একবচন ২. বহুবচন।

১. একবচন : যে শব্দ দিয়ে কোনো বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন :

পাখাটি খুঁজে পাচ্ছি না।
গামছাধানা কোথায় রাখলে?
কাজল কি বাড়ি ফিরেছে?
শিক্ষক বললেন, “দুই আর দুই চার হয়।”

একবচন প্রকাশের উপায়

বাংলা ভাষায় একবচন প্রকাশের কিছু উপায় আছে। যেমন :

ক. শব্দের মূল রূপের সাথে কিছু যোগ না করে :

‘আমার বাড়ি যাইও ভৱ, বসতে দেব পিঁড়ে।’
আজ স্কুল ছুটি।
রীতা গান শিখতে গেছে।
বাস ঢাকা ছেড়েছে।

খ. শব্দের শেষে টি, টা, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক যোগ করে :

মেয়েটি খুব চালাক।
তোমার কলমটা দাও তো।

নৌকাখানি বেশ সুন্দর হয়েছে।
 বইখানা আমি পড়েছি।
 দড়িগাছ দিয়ে যা তো মা।
 দাদুর হাতে জাঠিগাছা বেশ মানিয়েছে।

গ. শব্দের আগে এক, একটা, একটি, একখানা, একজন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে :

এক দেশে ছিল এক রাজা।
 তোমার সাথে একটা কথা ছিল।
 একটি কলম নিয়ে দুভাইয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়েছে।
 একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ এনো তো।
 একজন ছাত্র এসেছিল তোমার কাছে।

২. বহুবচন : যে শব্দ দিয়ে একের অধিক সংখ্যক বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীর ধারণা পাওয়া যায়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন :

আমরা সেখানে পিয়েছিলাম।
 ছেলেরা মাঠে খেলছে।
 ‘শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।’
 ‘রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।’

বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ

বাংলা ভাষায় বহুবচন গঠনের নানা উপায় আছে। প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং উন্নত প্রাণিবাচক ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দত্বে বিভিন্ন ধরনের বহুবচনবোধক বিভক্তি, প্রত্যয় ও সমষ্টিবাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন :

১. শব্দের শেষে রা, এরা, গুলো, গুলি, দের বিভক্তি যোগ করে :

রা – ছেলেরা বল খেলছে।
 তারা আজ আর আসবে না।
 এরা – ‘ভাইয়েরা আমার, ‘রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব’।’”
 শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডেকেছে।
 গুলো – আমগুলো রাজশাহী থেকে এসেছে।
 ছেলেগুলো খুব হৈচে করছে।

গুলি – বইগুলি জায়গা মতো তুলে রাখ ।

দের – মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা শুন্ধা করি ।

২. শব্দের শেষে গণ, বৃদ্ধ, বর্ণ, কূল, মঙ্গলী, মালা, গুচ্ছ, পাল, দল, দাম, ঝাঁক, আবলি, সব, সমূহ, রাঙ্গি, রাশি, পুঁজি, শ্রেণি ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে :

গণ – ‘শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ।’

বৃদ্ধ – ভক্তবৃন্দ কবিকে শুভেচ্ছা জানালেন ।

কূল – সন্ধ্যায় পক্ষিকূল কূলায় ফিরে এসেছে ।

মঙ্গলী – শিক্ষকমঙ্গলী নবীন ছাত্রদের বরণ করে নিলেন ।

মালা – ‘দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু ।’

গুচ্ছ – আমি রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ পড়েছি ।

পাল – ‘রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে ।’

দল – জাতীয় ক্রিকেটদলে তার জায়গা হয়েছে ।

দাম – শৈবালদামে পুকুর ভরেছে ।

ঝাঁক – পায়রার ঝাঁক বাকুম বাকুম করছে ।

আবলি – আজ রাতে পদাবলি কীর্তন শুনতে যাব ।

সব – ‘পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল ।’

সমূহ – অতিরিক্ত বৃক্ষনিধনের ফলে বনসমূহ উজাড় হয়ে যাচ্ছে ।

রাঙ্গি – লাইব্রেরির গ্রন্থরাঙ্গির মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ।

রাশি – বাজারে নিয়ে যাবার জন্য পুক্ষরাশি চয়ন করা হয়েছে ।

পুঁজি – মেঘপুঁজের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে ।

শ্রেণি – ধনিকশ্রেণি সব সময় নিম্নশ্রেণির উপর খবরদারি করে থাকে ।

৩. শব্দের আগে অনেক, অজন্ম, অসংখ্য, প্রচুর, বহু, বিস্তর, নানা, চের, সব, সকল, সমস্ত, হরেক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে :

অনেক – এবার পরীক্ষায় অনেক ছাত্র ফেল করেছে ।

অজন্ম – তার অজন্ম টাকা-পয়সা হয়েছে ।

অসংখ্য – বাহ্লাদেশের অসংখ্য মানুষ এখনো অশিক্ষিত ।

প্রচুর – বাজারে প্রচুর আম উঠেছে ।

বহু – তিনি বহু সম্পত্তির মালিক ।

বিস্তর – ‘সে কহে বিস্তর যিছা, যে কহে বিস্তর ।’

২০
নানা – ‘নানা মুলির নানা মত ।’

চের – বৃক্ষ আসতে এখনো চের বাকি।

সব – বাজারে গিয়ে সব টাকা খরচ হয়ে গেল।

সকল – পৃথিবীর সকল মানুষ আমার ভাই।

সমস্ত – তার সমস্ত কাহিনীই ছিল বানেয়াট।

হরেক – মেলায় হরেক রকম জিনিস পাওয়া যায়।

৪. একই শব্দ পর পর দুবার বসিয়ে :

ফুলে – বাগানটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

ইাড়ি – বরযাত্রীরা ইাড়ি ইাড়ি সন্দেশ নিয়ে এসেছে।

কাঁড়ি – মেয়ের বিয়েতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা হয়ে গেল।

বলে – তোমাকে বলে বলে আর পারলাম না।

খেটে – আমি খেটে খেটে সারা হলাম।

ঢারে – ঢারে ঢারে ঘুরেও আজ ভিঙ্গা জুটল না।

ছোট – ‘আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর।’

বড় – বাবা বড় বড় আম কিনে এনেছেন।

ঘরে – আজ ঘরে ঘরে বিজয়ের আনন্দ।

বিন্দু – বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে তৈরি হয় বিশাল সাগর।

ভালো – ক্লাসের ভালো ভালো ছেলেকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে- যে যে যাবে, তারা লঞ্চে উঠো।

৫. আগে সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে :

কাঞ্চনের বিয়েতে শ গাঁচেক অতিথি খাবে।

সপ্তাহ দুই পরে মাছের দাম কমে যাবে।

শিয়াল তার সাত ছেলেকে কুমিরের কাছে পড়তে দিল।

দশ কেজি রসগোল্লা দিন তো।

৬. কখনো কখনো একবচনের রূপ দিয়ে :

মানুষ মরণশীল।
 বাঞ্ছালি সব পারে।
 বাগানে ফুল ফুটেছে।
 বাজারে লোক জমেছে।
 পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়।
 বনে বাঢ় থাকে।
 গরু আমাদের দুধ দেয়।

* বিশেষ দ্রষ্টব্য

বচন মূলত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যার ধারণা নির্দেশ করে। সে-কারণে শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়।

উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে গণ, বৃদ্ধ, মণ্ডলী, বর্গ এবং অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঁজি, মালা, রাজি, রাশি ব্যবহৃত হয়।

রা, এরা, গণ, গুলো, কুল, সকল, সব, সমূহ প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলা বাক্যে একই সঙ্গে একাধিক বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন :

সকল ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (ভুল)
 সকল ছাত্রকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (শুন্ধি)
 ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (শুন্ধি)

৪.৩ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

আগেই বলা হয়েছে : পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

বিশেষ্যপদ

বাক্যে ব্যবহৃত যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কাজ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্যপদ বলে। এক কথায়, কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলে। যেমন : নজরুল, মানুষ, বই, খাতা, লেখাপড়া, পশু, সতা, সমিতি, ঢাকা, খুলনা, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি।

বিশেষ্যপদের নামা শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যেমন :

১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রন্থ ইত্যাদির নির্দিষ্ট নাম বোঝায়, তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। একে নামবাচক বিশেষ্যও বলা হয়। যেমন :

ব্যক্তির নাম : আলাউল, বঙ্কিম, নজরুল, সুকান্ত, রোকেয়া, সমীরণ বড়ুয়া, রবার্ট, মিল্টন, হ্যারি।

প্রাণীর নাম : গরু, ছাগল, ভেড়া, সিংহ, বাঘ, হাঁস, মুরগি, ময়না, টিয়া, শালিক, হিপপোটেমাস।

স্থানের নাম : খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, দিল্লি, মস্কো, লন্ডন, প্যারিস।

নদ-নদীর নাম : ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, নীলনদ, আমাজন, হোয়াৎহো।

সমুদ্রের নাম : বঙ্গোপসাগর, ভাৱত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, আৱৰ সাগৰ।

পাহাড়-পর্বতের নাম : গারো পাহাড়, হিমালয়, লালমাই, কেওকুড়াং, হিন্দুকুশ, ককেশাস, আন্দিজ।

গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, হিমু অমনিবাস, বেড়াল মানবী, বাঁধ ভেঙে দাও।

বাক্যে প্রয়োগ

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি।

সুন্দরবন খুলনা জেলায় অবস্থিত।

আমাদের বাড়ি ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে।

আমি ‘অগ্নিবীণা’ পড়েছি।

গরু গৃহপালিত পশু।

আমি হিমালয় দেখি নি।

লন্ডনে নজিৰের মামা থাকেন।

দুবলারচর বঙ্গোপসাগরের একটি চৰ।

২. শ্রেণিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, নদী, পর্বত ইত্যাদির সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে শ্রেণিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, পাখি, পর্বত, কবি, শহর, বই, গাছ, বাঞ্জলি, মাছ, সাগৰ ইত্যাদি।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের সাথে শ্রেণিবাচক বিশেষ্যের আপাত মিল লক্ষ কৱা গেলেও বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বা স্থানের নাম বোঝায়।

কিন্তু শ্রেণিবাচক বিশেষ্যপদ এসবের সাধারণ বা অনির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করে। যেমন :

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (নির্দিষ্ট)

১. রবীন্দ্রনাথ বিখ্যকবি।
২. মানুষটি ক্ষুধায় কাতর।
৩. পোড়াবাড়ির চমচম খুব মিষ্টি।
৪. আমি ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসি।
৫. আমরা ঢাকা শহরে থাকি।
৬. আমি ‘অগ্নিবীণা’ পড়ছি।
৭. হিমালয় বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত।
৮. ময়না পাথি কথা বলে।
৯. পদ্মা বাংলাদেশের বড় নদী।
১০. সুন্দরীগাছ সুন্দরবনে পওয়া যায়।

শ্রেণিবাচক বিশেষ্য (অনির্দিষ্ট)

১. কবি চিরকাল বরণীয়।
২. মানুষ মরণশীল।
৩. মিষ্টি সবাই পছন্দ করে না।
৪. সবাই মাছ খেতে ভালোবাসে।
৫. আমরা শহরে থাকি।
৬. আমি বই পড়ছি।
৭. পর্বতে ওঠা খুব বিপজ্জনক।
৮. পাথি আকাশে ওড়ে।
৯. নদী সাগরে গিয়ে মেশে।
১০. গাছ আমাদের প্রাণ বাঁচায়।

৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা একজাতীয় ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : জনতা, সভা, সমিতি, শ্রেণি, দল, সংঘ, পাল, ঝাঁক, গুচ্ছ, মালা, সারি ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ

জনতা ক্ষেপে গেলে কারও রক্ষা নেই।

সভা নয়টায় শুরু হয়েছে।

এখানে একটা বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে।

বিশেষ্যপদের নানা শ্রেণিবিভাগ রয়েছে।

দল বদল করে আর কতদিন চলবে?

একগোল হরিগ আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

ইংরেজদের নৌবহর বিশ্বখ্যাত।

আমি সেনাবাহিনীর কৃচকাওয়াজ দেখেছি।

৪. ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : তোজন, শয়ন, দর্শন, গমন, শ্রবণ, করা, দেখা, শোনা ইত্যাদি।

ভাববাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ এক নয়। যেমন :

ভাববাচক বিশেষ্য	ক্রিয়াপদ
১. কোটবাড়ি দর্শন করে এলাম।	১. আমি কোটবাড়ি দেখেছি।
২. মহারাজের ভোজন-পর্ব শেষ হয়েছে।	২. আমরা খেয়েছি।
৩. বাবাৰ শয়ন এখনো সম্ভল হয় নি।	৩. বাবা শুয়েছেন।
৪. খুকুৰ নাচন দেখে যা।	৪. খুকু নাচছে।
৫. তাৰ বোধহয় ফেৱা হবে না।	৫. সে ফিরেছে।

৪.৪ নির্দেশক সর্বনামের রূপ (চলিত রীতি) : ‘এ’, ‘ও’

বাক্যে বিশেষ্যপদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনামপদ বলে। যেমন :

বিশেষ্য : বকুল তালো ছেলে।

সর্বনাম : সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।

তাৰ স্বাস্থ্য তালো।

তাকে সবাই তালোৰাসে।

এখনে বিশেষ্য ‘বকুল’-এর পরিবর্তে ‘সে’, ‘তাৰ’, ‘তাকে’ প্রতৃতি পদ ব্যবহার কৰায় বাক্যগুলো শুতিমধুর হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামপদ নানারকম হয়। যেমন :

১. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাৰা, তিনি, এৱা, ওৱা ইত্যাদি।

২. নির্দেশক সর্বনাম : এ, এটি, সেটি, সেগুলো ইত্যাদি।

৩. সাক্ষ্যবাচক সর্বনাম : সকল, সব, সমুদয় ইত্যাদি।

৪. সাপেক্ষ সর্বনাম : যে-সে, যা-তা, যিনি-তিনি ইত্যাদি।

৫. প্রশংসূচক সর্বনাম : কী, কাৰ, কাদেৱ, কিসে ইত্যাদি।

৬. অনির্দেশক সর্বনাম : কেউ, কোন, কেহ, কিছু ইত্যাদি।

৭. আত্মবাচক সর্বনাম : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি ইত্যাদি।

৮. অন্যাদিবাচক সর্বনাম : অন্য, অপৱ, পৱ ইত্যাদি।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମେର ରୂପ : ‘ଏ’, ‘ଓ’

যে সর্বনামপদ সাধারণত বিশেষজ্ঞকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাকে নির্দেশক সর্বনামপদ বলে। যেমন :
এ, এই, এরা, ইহারা, ইহা, এঁরা, ইহাদের, এঁদের, ও, ওরা, ওদের,
ওঁদের, ঐ, উনি, উহা, উহাদের ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞদের সাথে যেমন বিভিন্ন যোগ হয়ে শব্দগঠন করে, তেমনি বিভিন্ন, প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হয়ে সর্বনামের রূপ হয়।

নিচে নির্দেশক সর্বনাম ‘এ’ এবং ‘ও’—এর চলিত রূপ দেখানো হলো।

ଏ-ଏର ରୂପ

১. প্রাণিবাচক রূপ :	একবচন	বহুবচন
	এ, এর, ইনি, এঁর	এরা, এদের, এঁরা, এঁদের

বাক্যে প্রয়োগ : এ আমার ভাই; এর নাম উজ্জ্বল।

ଇନି ଆମାର ଚାଚା; ଏହା କରାଟି ଥାକେନ । ଏଦେର ଲୋହାଲକ୍ଷ୍ମେର ବଡ଼ ବ୍ୟବସା ଆଛେ ।

বাক্যে প্রয়োগ : এটা এখান থেকে সরাও।

এটি আপনার বই।

ଏଗ୍ରଲୋ ଟେବିଲେ ରାଖ ।

এসবের জন্য তুমি দায়ী ।

এসমস্ত কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?

ଓ-এর রূপ

বাক্যে প্রয়োগ : ও যেন ফিরে আসে।

উনি সম্পর্কে আমার মামা হন। ওঁদের বাড়ি ময়মনসিংহ।

ওকে এখন ডাকার দরকার নেই।

ଓদেৱ যেতে বল ।

৪.৫ ধাতু ও ক্রিয়াপদ

କିମ୍ବାପଦ

যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা বা কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্ষিয়াপদ বলে। যেমন :
বাবা এসেছেন।
ঘড়িতে দশটা বাজে।
আমি অঙ্গ করছি।

କ୍ରିୟାପଦ ନାନା ରକ୍ତ ହ୍ୟ :

১. সমাপিকা ক্লিয়া : যে ক্লিয়া দ্বারা বাকেয়ের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় , তাকে সমাপিকা ক্লিয়া বলে । যেমন :
সেতু স্কুলে যায় ।
বিদ্যু গান গায় ।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন :
আমি বাড়ি গিয়ে
মে বই নিয়ে

এখনে ‘গিয়ে’, ‘নিয়ে’ ক্রিয়ার দ্বারা কথা শেষ হয় নি। বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ রয়েছে। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য আরও ক্রিয়া চাই। যেমন :

আমি বাড়ি গিয়ে থাব।
সে বই নিয়ে পড়তে বসেছে।

সুতরাং, ‘গিয়ে’, ‘নিয়ে’ হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া। আর ‘ধাব’, ‘বসেছে’ এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া।

৩. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন :

স্বপন চিঠি লিখছে।

কাঞ্চন বই পড়ছে।

৪. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন :

স্বপন লিখছে।

কাঞ্চন পড়ছে।

৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন :

শিক্ষক ছাত্রদের বাংলা পড়াচ্ছেন।

মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

৬. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন :

মা খোকাকে টাঁদ দেখাচ্ছেন।

সাপুড়ে সাপ খেলায়।

৭. যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন :

সে পাস করে গেল।

সাইরেন বেজে উঠল।

৪.৬ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদের কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

বাক্যের ক্রিয়াকে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্মপদ। কর্মযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন :

মা ভাত রান্না করছেন।

এ বাক্যে ক্রিয়াপদ হচ্ছে ‘রান্না করছেন’।

প্রশ্ন : কি রান্না করছেন?

উত্তর : ভাত।

অতএব ‘রান্না করছেন’ ক্রিয়াপদটির কর্ম হচ্ছে ‘ভাত’। ‘রান্না করছেন’ সকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন :

সৌরভ পড়ে।

সৌরত কী পড়ে? – এ প্রশ্নের উত্তর নেই। অর্থাৎ এ বাকেয় ‘পড়ে’ ক্রিয়াপদের কোনো কর্ম নেই। তাই ‘পড়ে’ অকর্মক ক্রিয়া।

প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়া হতে পারে। যেমন :

সকর্মক ক্রিয়া

১. আমি টিফিন খেয়েছি।
২. মাখন রায় গান গাচ্ছে।

অকর্মক ক্রিয়া

১. আমি টিফিনে খেয়েছি।
২. মাখন রায় গানে মজেছে।

ধাতু

ক্রিয়ার মূল অংশকে ধাতু বলে।

ক্রিয়াপদকে বিশেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় :

১. ধাতু বা ক্রিয়ামূল : ক্ৰ, যা, খা, পা, ব্ৰ, দেখ, শ্বেল, দে ইত্যাদি।
২. ক্রিয়াবিভক্তি : আ, ই, ছি, ছে, বে, তে, লে, লাম ইত্যাদি।

ধাতু তিন প্রকার। যথা : ১. মৌলিক ধাতু ২. সাধিত ধাতু ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু : যেসব ধাতু বিশেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক ধাতু বলে। যেমন : ক্ৰ, চ্ৰ, পড়, বড়, পা, যা, দে, খা, হ ইত্যাদি।

২. সাধিত ধাতু : মৌলিক ধাতু বা নাম-শব্দের পরে আ- প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন :

ক্ৰ + আ = কৰা

দেখ + আ = দেখা

ব্ৰ + আ = বলা

৫. যৌগিক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে ক্ৰ, দে, হ, পা, খা ইত্যাদি মৌলিক ধাতু মিলিত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু বলে। যেমন : তয় ক্ৰ, ভালো হ, উত্তর দে, মার খা, দুঃখ পা ইত্যাদি।

৪.৭ মৌলিক ও সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু : মৌলিক ধাতুকে ভাঙা বা বিশেষণ করা যায় না। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতু তিনি প্রকার। যথা :

১. সংস্কৃত ধাতু
২. বাংলা ধাতু
৩. বিদেশাগত ধাতু

১. সংস্কৃত ধাতু : তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতুকে সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন :

অঙ্ক + অন = অঙ্কন : ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিথু প্রথম হয়েছে।

দৃশ্য + য = দৃশ্য : দুর্ঘটনার মর্মাণ্ডিক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না।

কৃ + তব্য = কর্তব্য : ছাত্রদের কর্তব্য লেখাপড়া করা।

হস্ত + য = হাস্য : অকারণ হাস্যপরিহাস ত্যাগ কর।

২. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়, তাকে বাংলা ধাতু বা খাটি বাংলা ধাতু বলে। যেমন :

আঁক + আ = আঁকা : কী সব আঁকাআঁকি করছ?

দেখ + আ = দেখা : জাদুর আমার কয়েকবার দেখা।

কর + অ = কর : তুমি কী কর?

হাস + ই = হাসি : তোমার হাসিটি খুব সুন্দর।

৩. বিদেশাগত ধাতু : বিদেশি ভাষা থেকে আগত যেসব ধাতু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাকে বিদেশাগত ধাতু বা বিদেশি ধাতু বলে। যেমন :

খাট + বে = খাটবে : যত বেশি খাটবে ততই সুফল পাবে।

বিগড়ু + আনো : তোমার বিগড়ুনো ছেলেকে ভালো করার সাধ্য আমার নেই।

টান + আ : আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না, আমি যাব না।

জম + আট = জমাট : অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধেছে।

সাধিত ধাতু : মৌলিক ধাতু বা নাম শব্দের পরে আ-প্রত্যয়যোগে সাধিত ধাতু গঠিত হয়ে থাকে।

সাধিত ধাতু তিনি প্রকার। যথা :

১. প্রযোজক ধাতু
২. নাম ধাতু
৩. কর্মবাচ্যের ধাতু

১. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) আ-প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে প্রযোজক ধাতু বা শিঙ্গন্ত ধাতু বলে। যেমন :

পড়ু + আ = পড়া : শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

করু + আ = করা : সে নিজে করে না, অন্যকে দিয়ে করায়।

নাচ + আ = নাচা : ‘ওরে ডোড় ফিরে চা, খুকুর নাচন দেখে যা।’

২. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ ও অনুকার অব্যয়ের পরে আ-প্রত্যয়যোগে গঠিত ধাতুকে নাম ধাতু বলে।
যেমন :

ঘুম + আ = ঘুমা : বাবা ঘুমাচ্ছেন।

ধমক + আ = ধমকা : আমাকে যতই ধমকাও, আমি এ কাজ করব না।

হাত + আ = হাতা : অন্যের পকেট হাতানো আমার স্বতাব নয়।

৩. কর্মবাচ্যের ধাতু : বাক্যে কর্তার চেয়ে কর্মের সাথে যথন ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে, তখন সে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলে। কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার মূলকে কর্মবাচ্যের ধাতু বলে।

মৌলিক ধাতুর সাথে আ-প্রত্যয়যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। যেমন :

করু + আ = করা : আমি তোমাকে অঙ্কটি করতে বলেছি।

হারু + আ = হারা : বইটি হারিয়ে ফেলেছি।

খা + ওয়া = খাওয়া : তোমার খাওয়া হলে আমাকে বলো।

৪.৮ ক্রিয়ার কাল : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা

লক্ষ কর :

১. আজ স্কুল খোলা।
২. গতকাল স্কুল বন্ধ ছিল।
৩. আগামীকাল থেকে পরীক্ষা শুরু।

ওপরের বাক্য তিনটিতে ক্রিয়াপদগুলো নিষ্পন্ন হবার বিভিন্ন সময় বোঝানো হয়েছে। প্রথম বাক্যে ‘খোলা’ ক্রিয়াটি বর্তমান সময়ে নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বাক্যে ‘ছিল’ ক্রিয়াটি পূর্বে বা অতীতে সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয়

বাকে 'হবে' ক্রিয়াটি দ্বারা কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মনোভাব প্রকাশের জন্য বাকের ক্রিয়াপদ বিভিন্ন সময় বা কালে সম্ভব হওয়া নির্দেশ করে থাকে। ক্রিয়া সম্ভব হওয়ার এই সময় বা কালকে ক্রিয়ার কাল বলে।

ক্রিয়ার কাল তিনি প্রকার। যথা :

১. বর্তমান কাল
২. অতীত কাল
৩. ভবিষ্যৎ কাল

১. বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া এখন সম্ভব হয় বা হচ্ছে বুঝায়, তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন :

আমি পড়ি।

সে যায়।

কাকলি দৌড়ায়।

আইয়ুব গান গায়।

২. অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগেই সম্ভব হয়েছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন :

আমি তাকে দেখেছিলাম।

গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।

মা রান্না করছিলেন।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া আগামীতে বা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন বোঝায়, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন :

বৃক্ষ আসবে।

সীমা কাল গান গাইবে।

পার্থ নাচবে।

প্রত্যেকটি কাল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. বর্তমান কাল : ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাঘটিত বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত

৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

১. বর্তমান কাল

ক. সাধারণ বর্তমান : যে ক্রিয়ার কাজটি বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে বা হয়, তাকে সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন :

সকালে সূর্য ওঠে।

দুই আর দুইয়ে চার হয়।

আমি রোজ বিদ্যালয়ে পড়তে যাই।

খ. ঘটমান বর্তমান : যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে ঘটছে বা চলছে, এখনো শেষ হয়ে যায় নি, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন :

আমার ছেট ভাই লিখছে।

ছেলেরা এখনো ফুটবল খেলছে।

টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক দেখাচ্ছে।

গ. পুরাণচিত বর্তমান : যে ক্রিয়া কিছু আগে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো রয়েছে, তাকে পুরাণচিত বর্তমান কাল বলে। যেমন :

এখন বাবা অফিস থেকে ফিরেছেন।

এবার মা খেতে ডেকেছেন।

অবশ্যে আমি ইংরেজি পড়া শেষ করেছি।

২. অতীত কাল

ক. সাধারণ অতীত : যে ক্রিয়া অতীত কালে সাধারণভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন :

তিনি খুলনা থেকে এলেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক খুব ভালো ব্যাট করলেন।

আমি খেলা দেখে এলাম।

খ. ঘটমান অতীত: যে ক্রিয়া অতীত কালে চলেছিল, তখনো শেষ হয় নি বোঝায়, তাকে ঘটমান অতীতকাল বলে। যেমন :

রিতা ঘুমাচ্ছিল।

সুমন বই পড়চ্ছিল।

আমি ছেলেবেলার কথা ভাবছিলাম।

গ. পুরাষ্টিত অতীত : যে ক্রিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তার কালকে পুরাষ্টিত অতীত কাল বলে।
যেমন :

আমরা রাজশাহী গিয়েছিলাম।
তুমি কি তার পরীক্ষা নিয়েছিলে ?
আমি তাকে ভাত খেতে দেখেছিলাম।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত : যে ক্রিয়া অতীতে প্রায়ই ঘটত এমন বোঝায়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন :
বাবা প্রতিদিন বাজার করতেন।
স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে রোজ পড়া নিয়ে আলাপ করতাম।
ছুটিতে প্রতি বছর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম।

৩. ভবিষ্যৎ কাল

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া পরে বা আগামীতে সাধারণভাবে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন :

বাবা আজ আসবেন।
'আমি হব সকালবেলার পাথি।'
তুমি হয়তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' পড়ে থাকবে।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে শুরু হয়ে চলতে থাকবে, তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন :

সুমন হয়তো তখন দেখতে থাকবে।
মনীষা দৌড়াতে থাকবে।
আমিনা কথা বলতে থাকবে।

গ. পুরাষ্টিত ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে এবং সেটি বোঝাতে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়, এমন হলে তার কালকে পুরাষ্টিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন :

তুমি হয়তো আমাকে এ কথা বলে
সম্ভবত আগামীকাল পরীক্ষার ফল বের হয়ে থাকবে।
কাঞ্চন বোধহয় কঠিন অঙ্কটা বুঝে থাকবে।

৪. অনুজ্ঞা

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয়, তাকে অনুজ্ঞা বলে। যেমন :

১. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা : তোমরা কাজ করো।

রোহান লিখুক।
মিথ্যা কথা বলো না।
অঙ্কটা বুঝিয়ে দেবেন?
আমাকে তুমি রক্ষা করো, প্রভু।
আদেশ করুন জাহাঁপনা।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম ও নাম পুরুষের রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
তুচ্ছার্থক	তুই, তোরা	-ও শূন্য	কর, যা, পা, খা, দে
সাধারণ	তুমি, তোমরা, সে, তারা	-অ, -ও, -উক	করো, যাও, খাও, দেও
সন্ত্রমাত্রক	আপনি, আপনারা, তাঁরা, তিনি	-উন, -ন, -এন	যাউন, যান, করুন, করেন

২. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা : সব সময় সত্যি বলবে।

বড় হও, বুঝতে পারবে।
অসুস্থ হলে ওমুখ খাবে।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার মধ্যম ও নাম পুরুষের রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
তুচ্ছার্থক	তুই, তোরা	-স	করিস, যাস, খাস
সাধারণ	তুমি, তোমরা, সে, তারা	-ও, -বে	করো, করবে, খেও, যাবে
সন্ত্রমাত্রক	আপনি, আপনারা, তাঁরা, তিনি	-বেন	করবেন, দেখবেন, যাবেন, দেবেন

৪.৯ কর্ম-অনুশীলন

১. বাবুদের বাড়ির ছেলেগুলো খুব ভালো। তারা বিস্তর লেখাপড়া করে। সকল লোক তাদের ভালোবাসে। স্কুলে ওরা শিক্ষকমণ্ডলীর নয়নমণি। তারা বস্তুমহলেও অনেক জনপ্রিয়। গুরুজনেরা ওদের রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুছ’ পড়িয়েছেন।

—উপরের অনুচ্ছেদটিতে মোটা দাগের শব্দগুলো বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয় ও শব্দ। এগুলো তোমার খাতায় লেখ। তারপর এগুলোর কোনটি প্রাণিবাচক কোনটি অপ্রাণিবাচক বা কোনটি উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা একটি ছকের মধ্যে প্রকাশ কর।

২. আমার বাবা একজন শিক্ষক। চাচা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। আমার মামা একজন পুলিশ অফিসার। আমার দাদি ও নানি আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমাদের একজন গৃহকর্মী আছে, তাকে সবাই বলে আয়া। আমি ওস্তাদের কাছে গান শিখি। আমার ওস্তাদ একজন বড় গায়ক। আমাদের মালী আমাকে ফুল গাছের যত্ন করতে শেখায়। রাজা-বাদশাহ, রাক্ষস-দানব-ভূত-পিশাচের গল্প শোনায়। আমার বস্তু মালাও এসব গল্প শোনে। তার একটি মেনি বিড়াল আছে, সেটিও শোনে।

—উপরের অনুচ্ছেদ থেকে বিভিন্ন লিঙ্গবাচক শব্দগুলো খুঁজে বের কর এবং সেগুলোর কোনটি কোন শ্রেণির লিঙ্গের অন্তর্গত তালিকাকারে লেখ।

৩. নদী পার হয়ে, ওপাড়ে কুমোরদের একটা গ্রামের ভেতরে সারাদিন দেখেছি ওদের মাটির কাজ। হাঁড়ি পাতিল সরা সানকি তৈরি করছে ওরা। বেশি কৌতুহল নিয়ে দেখেছি পাটার কাজ। মাটির পাটায় ফুলের নকশা, রবীন্দ্রনাথ, বেণীবন্ধনরত যুবতীর চিত্র, জয়নুলের ঝাঁকা গুরুর চাকা ঠেলে তোলার প্রতিলিপি, উড়ন্ত পরী, ময়ূরপঙ্খি নোকোর চিত্র, চোখ বুজে নজরুল যে বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই ফটোগ্রাফের নকল। বাঁশবনে আচ্ছন্ন শীতল একটি গ্রামে, অবিশ্বাস্য বিম ধরা নীরবতার ভেতরে, সবুজ শ্যামলা ধরা কুমোরদের প্রাঞ্জলে সার দিয়ে সাজানো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জয়নুল।

—উপরের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ্য (সংজ্ঞবাচক, শ্রেণিবাচক, সমষ্টিবাচক), ক্রিয়া (সমাপিকা, অসমাপিকা) পদগুলো খুঁজে বের করে একটি ছক তৈরি কর।

৪. সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে কয়েকটি বাক্য বানাও। যেমন :

ক. চঙ্গীদাস বলেন, ‘সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’
[অতীত কালের অর্থে, প্রাচীন লেখকের উন্মুক্তি দিতে]

খ. এখন তবে আসি।
[ভবিষ্যৎ কালের অর্থে, অনুমতি প্রার্থনায়]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শব্দগঠন

৫.১ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দবৈত

৫.২ শব্দ গঠন : প্রাথমিক ধারণা

৫.৩ কর্ম-অনুশীলন

৫.১ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দবৈত

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাজনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন :

খেউ খেউ (কুকুরের ডাক বা ধ্বনি)

মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ)

ঠা ঠা (রোদের তীব্রতার অনুভব)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ কতগুলো ধ্বনির মিলিত রূপ। এই সম্মিলিত ধ্বনি একদিকে কানে শোনা ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্টি, অন্যদিকে মানুষের নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতীক।

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হলে এগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন :

১. মানুষের ধ্বনির অনুকৃতি :

ভেউ ভেউ : লোকটি ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করল।

হি হি : এত হি হি করে হাসার কারণ কী?

ট্যা ট্যা : কানের কাছে এত ট্যা ট্যা করো না তো, মাথা ধরে গেল।

গুনগুন : মেয়েটি গুনগুন করে গান গাইছে।

থক থক : বুড়ো লোকটি থকথক করে কাশছে।

২. জীবজন্মের ধ্বনির অনুকৃতি :

- ঘেউ ঘেউ : কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে চিঢ়কার করছে।
 মিউ মিউ : বিড়ালটি মিউ মিউ করে ডেকে কোলে এসে বসল।
 কুহু কুহু : বসন্তে কোকিল ডেকে ওঠে কুহু কুহু রবে।
 কা কা : কাকগুলো একসাথে কা কা করে ডেকে উঠল।
 গর গর : তখন বাঘটি রাগে গর গর করতে লাগল।

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকৃতি :

- ঘচঘচ : কৃষকেরা ঘচঘচ করে ধান কেটে চলেছে।
 মড়মড় : গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল।
 গুড়গুড় : গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে।
 কলকল : কলকল করে নদী বয়ে চলেছে।
 বায়বায় : বায়বায় করে বৃষ্টি নামল।

৪. অনুভূতির কাঞ্চনিক অনুকৃতি :

- ঝিকিমিকি : ‘ঠাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।’
 ঠা ঠা : ঠা ঠা রোদে ঘুরে বেড়িও না।
 কুট কুট : মশায় কুট কুট করে কামড়াচ্ছে।
 ছম ছম : ভয়ে গা ছম ছম করছে।
 চৌ চৌ : ফিধেয় পেট চৌ চৌ করছে।

অনুকার শব্দ

শব্দের অনুকরণে বা বিকারে যেসব শব্দের সূর্যি হয়, তাকে অনুকার শব্দ বলে।

অনুকার শব্দ ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই রকমফের মাত্র। যেমন :

- আবোলতাবোল : নোমান সকাল থেকে আবোলতাবোল বকে চলেছে।
 কাগড়চোপড় : মা বাইরে যাবার জন্য কাগড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে বসে আছেন।
 খাবারদাবার : এইমাত্র খাবারদাবার শেষ হয়েছে।
 গোছগাছ : জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও, এক্ষুনি বেরুব।
 চোটপাট : আমাকে চোটপাট করে কোনো লাভ হবে না।
 জড়সড় : ভয়ে ছেলেটা জড়সড় হয়ে আছে।

টেনেটুনে : মেঘেটি টেনেটুনে পাস করেছে।

ফিটফাট : হীরা সব সময় ফিটফাট থাকে।

বকেবকে : শুধু বকেবকেকে কি ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায়?

মিটমাট : সমস্যাটা মিটমাট হয়ে গেছে।

রাঙ্গাবাঙ্গা : রাঙ্গাবাঙ্গা শেষ, এবার খাবার পালা।

শেষমেশ : ঘটনাটি শেষমেশ বড় কর্তার কানে গিয়ে উঠল।

হাবাগোবা : হাবলু এখনো হাবাগোবাই থেকে গেল।

দ্বিমুক্ত শব্দ

বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুবার ব্যবহার করলে তার অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে বা বিশেষভাবে জোরালো অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। এগুলোকে দ্বিমুক্ত শব্দ বলে। যেমন :

জ্বর (রোগ বিশেষ) : আমার জ্বর হয়েছে।

জ্বর জ্বর (জ্বরের ভাব, জ্বর নয়) : আমার জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে।

মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় এ রকম প্রচুর দ্বিমুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের দ্বিমুক্ত শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. শব্দের দ্বিমুক্তি বা শব্দদ্বৈত
২. পদের দ্বিমুক্তি বা পদদ্বৈত
৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিমুক্তি

শব্দদ্বৈত : একই শব্দ পর পর দুবার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দের দ্বিমুক্তি বা শব্দদ্বৈত বলে।

শব্দদ্বৈত নানাভাবে গঠিত হতে পারে। যেমন:

১. একই শব্দ দুবার ব্যবহার করে :

বছর বছর : বছর বছর পরীক্ষায় ভালো ফল করছ, এতে আমরা সবাই খুশি।

বস্তা বস্তা : বস্তা বস্তা ধান ভরে নিয়ে ট্রাকটি চলে গেল।

ফোটা ফোটা : বারাম্পার ছাদ থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে।

আস্তে আস্তে : একটু আস্তে আস্তে চল, আমার পায়ে ব্যথা।

চলতে চলতে : চলতে চলতে কথা বলো।

- মনে মনে : মনে মনে পড়ার চেয়ে আওয়াজ করে পড়া ভালো।
- জনে জনে : সকালে সূর্য ওঠে একথা জনে জনে জিজেস করে জানার প্রয়োজন হয় না।
- কথায় কথায় : কথায় কথায় তোমার কথা এসে গেল।
- খেয়ে খেয়ে : এ সমাজে অনেকেই খেয়ে খেয়ে দেহটা আলুর বস্তার মতো করে ফেলেছে।
- বলে বলে : ‘তোকে দিয়ে কিছুই হবে না’- একথা বলে বলে সবুজকে মনোবলহীন করা হয়েছে।

২. একই শব্দের সমার্থক (প্রায়) আর-একটি শব্দ ব্যবহার করে :

- আশা ভরসা : একমাত্র ছেলেটি বাবা-মায়ের আশা ভরসার স্বল্প।
- আতীয় স্বজন : বাড়িতে অনেক আতীয় স্বজন এসেছে।
- কথা বার্তা : তার সাথে আমার কথা বার্তা হয়েছে।
- চাল চলন : লোকটির চাল চলন রহস্যজনক।
- ঢাকচোল : ব্যাপারটা ঢাকচোল পিটিয়ে না জানালে কি চলত না?
- ধনদৌলত : কৃতুব্যদিন সাহেব অনেক ধনদৌলতের মালিক।
- ভয়ডর : ছেলেটির ভয়ডর বলে কিছু নেই।
- মাথামুঞ্চ : তোমার কথার মাথামুঞ্চ কিছুই বুঝালাম না।
- সুখশাস্তি : নেশাত্তস্ত ছেলেমেয়ের কারণে সংসারে সুখশাস্তি নষ্ট হয়।

৩. জোড় শব্দের পর-অংশ আর্থিক পরিবর্তন করে :

- কাছাকাছি : কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের বাড়ির কাছাকাছি আমরা থাকি।
- চেয়েচিষ্টে : অনেক চেয়েচিষ্টে তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এনেছি।
- ডাকাডাকি : আমাকে ডাকাডাকি করার দরকার হবে না, সময়মতো চলে যাব।
- মারধর : এত মারধর খেয়েও চোরটি চুরি করা মালামাল ফেরত দিল না।
- রাগারাগি : এসো রাগারাগি না করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি।

৪. বিপরীত শব্দযোগে :

- আসল-নকল : এখন আসল-নকল চেনা বড় দায়।
- আসা-যাওয়া : আমাদের বাড়িতে তার আসা-যাওয়া আছে।
- ইচ্ছা-অনিচ্ছা : তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু যায়-আসে না।
- বেচা-কেনা : উৎসবের বাজারে বেচা-কেনা বেশ জমে উঠেছে।
- জন্ম-মৃত্যু : জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে।
- দেনা-পাওনা : দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ইঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

- ভালো-মন্দ : মানুষের চরিত্রে ভালো-মন্দ দুদিকই থাকে।
 হার-জিত : খেলায় হার-জিত থাকবেই।

৫. অনুকার ধনিয়োগে :

- টুপটাপ : টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ছে।
 টুঁটাঁৎ : টুঁটাঁৎ বাজে টুঁটাঁৎ।
 চিকচিক : ‘চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা।’
 শনশন : শনশন করে বায়ু বয়।
 ছলছল : তার ঢোখ ছলছল করছে।
 টনটন : হাতটা ব্যথায় টনটন করছে।

৫.২ শব্দগঠন : প্রাথমিক ধারণা

এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। অর্থই শব্দের প্রাণ।

শব্দই বাকে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এজন্য নতুন নতুন শব্দগঠন করতে হয়। নানা উপায়ে শব্দগঠন হতে পারে। যেমন :

১. ব্যঙ্গনবর্ণের সাথে ‘কার’ যোগ করে :

$$\text{ব} + \text{ি} + \text{ডু} + \text{ি} = \text{বাড়ি}$$

$$\text{ত} + \text{্য} + \text{ণ} = \text{ত্যণ}$$

এ রকম : গাড়ি, বাবা, বিষ, নৌকা, কাকলি, রাজশাহী ইত্যাদি।

২. ব্যঙ্গনবর্ণের সাথে ‘ফলা’ যোগ করে :

$$\text{ক} + \text{ৱ} = \text{কৱ} : \text{বকৱ}$$

$$\text{ক} + \text{ল} = \text{কল} : \text{ক্লান্ত}$$

এ রকম : চকৱ, বাক্য, পদ্ম, রান্না ইত্যাদি।

এগুলো হচ্ছে শব্দগঠনের প্রাথমিক উপায়।

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে।
 যেমন : হাত, পা, মুখ, ফুল, পাখি, গাছ ইত্যাদি।

আবার কিছু শব্দ আছে যা বিভিন্ন উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় সাধিত শব্দ। যেমন :

$$\text{ডুব} + \text{উরি} = \text{ডুবুরি}$$

$$\text{ঘর} + \text{আমি} = \text{ঘরামি}$$

$$\text{মেঘ} + \text{এ} = \text{মেঘে ইত্যাদি।}$$

সাধিত শব্দ নালা উপায়ে গঠিত হতে পারে :

১. মৌলিক শব্দযোগে : পাগল + আমি = পাগলামি

বই + পত্র = বইপত্র

২. শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ করে : আমা + কে = আমাকে

বাড়ি + র = বাড়ির

চট্টগ্রাম + এ = চট্টগ্রামে

৩. শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে :

অ – অকাজ, অভাব, অনীল, অচেনা, অঈথে।

আ – আধোয়া, আলুনি, আগাছা, আগমন, আকর্ষ, আসমুদ্র।

নি – নিখুঁত, নিলাজ, নিরোট, নির্ণয়, নিবারণ, নিষ্কল্প।

বি – বিত্তুই, বিফল, বিপথ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল।

সু – সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকর্ষ, সুনীল, সুচতুর।

৪. শব্দের পরে প্রত্যয় যোগ করে :

আই : ঢাকাই, নিমাই, জগাই, মিঠাই।

উক : ভাবুক, মিশুক, মিথুক, লাজুক।

ইক : সাহিত্যিক, বৈদিক, দৈনিক, মাসিক।

অন : কাঁদন, বাঁধন, ভাঙন, জুলন।

খানা : চিড়িয়াখানা, বৈঠকখানা, ছাপাখানা।

অনীয় : করণীয়, বরণীয়, অরণীয়।

৫. সম্মিলিত সাহায্যে :

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

শীত + ঝত = শীতার্ত

পদ + হতি = পদ্ধতি

সম + তাপ = সন্তাপ

সম + বাদ = সংবাদ

দিক্ষ + অন্ত = দিগন্ত

পরি + ছদ = পরিছদ

৬. সমাসের সাহায্যে :

বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্ৰ

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

দুই দিকে অপ যার = দীপ

রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি

৭. শব্দবৈতর মাধ্যমে :

বাড়ি > বাড়ি বাড়ি

ঘরে > ঘরে ঘরে

চৎ > চৎ চৎ

লাল > লাল লাল

দলে > দলে দলে

৫.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. “মনে কর, তুমি রাস্তা দিয়ে ইঁটছ হনহনিয়ে। তোমার পায়ের কাছ দিয়ে সড়সড় করে চলে গেল একটা সাপ! তয়ে তোমার গা ছমছম করে উঠল। মাথা ঘুরে উঠল বনবন করে। তুমি ভেট ভেট করে না কেন্দে খাঁ খাঁ রোদুরেই শাঁ শাঁ করে দৌড়ে বাঢ়ি চলে এলে।”

— এই অনুচ্ছেদে ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি সেগুলো নির্দেশ কর এবং এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তুমিও একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২. “দিন দিন চাষের জমি-জমা কমছে। বন-টন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মাঠে-মাঠে ফসল নেই। বনে-বনে জীব-জন্ম নেই। বছর-বছর লোকজন বাঢ়ছে। বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, কল-কারখানা হচ্ছে। খাল-বিল, পুকুর-টুকুর দখল ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবেশ ও ভবিষ্যতের জন্যে এটি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।”

— উপরের অনুচ্ছেদে বিভিন্ন রকম দ্বিক্ষুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনটি কোন ধরনের দ্বিক্ষুক্ত শব্দ প্রয়োগ লক্ষ করে অর্থসহ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্য

- ৬.১ বাক্যগঠনের শর্ত : আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা
- ৬.২ খণ্ডবাক্য, আধীন ও অধীন খণ্ডবাক্য
- ৬.৩ সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন
- ৬.৪ কর্ম-অনুশীলন

৬. বাক্য

এক বা একাধিক পদের দ্বারা যথন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন :

লেখ।

আমি থাই।

কাজী সব্যসাচী বই পড়েন।

বাক্যের পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক বা অন্বয় থাকতে হয়, যার কারণে বক্তার মনোভাব বা বক্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

লক্ষ্য করুন :

গিয়ে পুকুরে বড় ধরেছি একটা মাছ।

ঝাঁ ঝাঁ অপু যাওয়ায় চলে করছে বাড়িটা।

বাক্য দুটোতে বক্তার মনোভাব পরিষ্কার নয়। কেননা, পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অন্বয় নেই। পদগুলো সুবিন্যস্ত নয়। তাই এগুলোকে বাক্য বলা যায় না। বাক্য হতে হলে পদগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে হবে।

যেমন :

পুকুরে গিয়ে বড় একটা মাছ ধরেছি।

অপু চলে যাওয়ায় বাড়িটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সাধারণত কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ নিয়ে বাক্য গঠিত হয়। তবে একটি বাক্যকে সার্থক করে তুলতে আরও কতকগুলো গুণ বা শর্ত মানতে হয়।

৬.১ বাক্য গঠনের শর্ত : আকাঙ্ক্ষা, আসন্তি, যোগ্যতা

একটি আদর্শ বা সার্থক বাক্য তখনই গঠিত হবে যখন বাক্যটির তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে। এ গুণগুলো হচ্ছে:

- ১. আকাঙ্ক্ষা
- ২. আসন্তি
- ৩. যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পুরোপুরি বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছা বা আগ্রহকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন :

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া ...

বললে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। আরও কিছু বলার বাকি থাকে। আরো কিছু শোনার ইচ্ছা জাগে।

যদি বলা হয়—

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করে। অথবা

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করতো। অথবা

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।

তবে শোনার ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়। আর এভাবে বাক্যও সম্পূর্ণ হয়।

২. আসন্তি : বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষা করে পদগুলোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখার নাম আসন্তি। যেমন :

বাবা বাজার ইলিশ থেকে এনেছেন।

—এখানে বক্তা যা বলতে চেয়েছেন তার সব উপকরণ আছে। কিন্তু পদগুলো যথাযথভাবে সাজানো হয় নি। ফলে সুস্পষ্ট কোনো অর্থও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু—

বাবা বাজার থেকে ইলিশ এনেছেন।

এভাবে লেখা হলে বক্তব্যটির অর্থ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে একটি সুগঠিত বাক্য হতো। তাই সার্থক বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর যথাযথ অবস্থানে থাকা আবশ্যিক।

৩. যোগ্যতা : বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও তাবের মিলবন্ধনকে যোগ্যতা বলে। যেমন :

আমরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরি।

এটি একটি সার্থক বাক্য। কেননা এখানে পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিল রক্ষিত হয়ে তা বিশ্বাসের জন্য দিয়েছে। কিন্তু—

আমরা বড়শি দিয়ে নারকেল পাঢ়ি।

বললে বক্তব্যটিতে অর্থ ও ভাবের অসংগতি প্রকাশ পায়। তা বিশ্বাসযোগ্যও হয় না। কারণ বড়শি দিয়ে কেউ নারকেল পাড়ে না। সুতরাং বাক্যে পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও ভাবের মিল রক্ষা করা আবশ্যিক। নয়তো যোগ্যতার অভাবে তা বাক্য হবে না।

৬.২ খন্দবাক্য, স্বাধীন ও অধীন খন্দবাক্য

খন্দবাক্য

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে :

১. উদ্দেশ্য : বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন :

শিমুল মাঠে খেলতে গেল।

২. বিধেয় : বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন :

শিমুল মাঠে খেলতে গেল।

একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় ক্রিয়া (সমাপিকা) সমষ্টি যদি নিজে একটি স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোনো বৃহত্তর বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে খন্দবাক্য বলে। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

—এ বাক্যে দুটি খন্দবাক্য আছে :

১. যারা ভালো ছেলে

২. তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

দুটি বাক্যই যেহেতু একটি বড় বাক্যের অংশ, সেহেতু বাক্যাংশ দুটি বড় বাক্যের খন্দবাক্য। খন্দবাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং তা অন্য একটি বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়।

খন্দবাক্য দু রকমের হয়। যথা : ১. স্বাধীন খন্দবাক্য ২. অধীন খন্দবাক্য

১. স্বাধীন খন্দবাক্য : একটি বড় বাক্যের অন্তর্গত যে খন্দবাক্য তার নিজের অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো খন্দবাক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাকে স্বাধীন বা প্রধান খন্দবাক্য বলে। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

এ বাক্যের ‘তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে’— এ খন্দবাক্যটিকে আলাদা বাক্য হিসেবেও লেখা যেতে পারে।

স্বাধীন খন্দবাক্যকে সম্পূর্ণ বাক্য থেকে তুলে নিয়ে আলাদাভাবে লিখলেও তার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়।

২. অধীন খন্ডবাক্য : একটি বড় বাক্যের অন্তর্গত যে খন্ডবাক্যটি তার অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য স্বাধীন খন্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল, তাকে অধীন খন্ডবাক্য বা আশ্রিত বা অপ্রধান খন্ডবাক্য বলে। অধীন খন্ডবাক্যকে সম্পূর্ণ বাক্য থেকে তুলে নিয়ে আলাদাভাবে লিখলে তার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না, আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

এ বাক্যের ‘যারা ভালো ছেলে’ খন্ডবাক্যকে আলাদা করে লিখলে ‘আকাঙ্ক্ষা’ গুণের বিষয় ঘটে।

অধীন খন্ডবাক্য তিনি রকমের :

ক. বিশেষস্থানীয় অধীন খন্ডবাক্য : যে অধীন খন্ডবাক্য স্বাধীন খন্ডবাক্যের যেকোনো পদের অধীন থেকে বিশেষের কাজ করে, তাকে বিশেষস্থানীয় অধীন খন্ডবাক্য বলে। যেমন :

আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম, সবার খাওয়া হয়ে গেছে।

খ. বিশেষগন্ধানীয় অধীন খন্ডবাক্য : যে অধীন খন্ডবাক্য স্বাধীন খন্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ বা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষগন্ধানীয় অধীন খন্ডবাক্য বলে। যেমন :

যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে। (অধীন খন্ডবাক্যটি ‘সে-ই’ সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)

গ. ক্রিয়া-বিশেষগন্ধানীয় অধীন খন্ডবাক্য : যে অধীন খন্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষগন্ধানীয় অধীন খন্ডবাক্য বলে। যেমন :

‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।’

৬.৩ সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন

গঠন অনুসারে বাক্য তিনি প্রকার। যথা :

১. সরল বাক্য
২. জটিল বাক্য
৩. যৌগিক বাক্য

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটিই সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

খোকন বই পড়ছে।

আমি বহু কফে সাঁতার শিখেছি।

জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

২. জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি স্বাধীন বাক্য এবং এক বা একাধিক অধীন বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন :

যিনি পরের উপকার করেন, তাকে সবাই শুন্দু করে।

কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করে আছি।

৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা তার অধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে যদি একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তবে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন :

ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।

দুঃখ এবং বিপদ এক সাথে আসে।

এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু গাড়ি পেলাম না।

জটিল ও যৌগিক বাক্য একাধিক বাক্যাংশ বা বাক্য দিয়ে গঠিত।

জটিল বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলো পরস্পর সাপেক্ষ, একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল।

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলো প্রায় স্বতন্ত্র। ও, এবং, আর, অথচ, কিন্তু, বরং ইত্যাদি অব্যয়যোগে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত খণ্ডবাক্যগুলো যুক্ত হয়। যেমন :

জটিল : যদিও লোকটি ধনী, তবুও সে কৃপণ।

যৌগিক : লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ।

জটিল : যদিও তাঁর টাকা আছে, তবু তিনি দান করেন না।

যৌগিক : তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।

জটিল : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক : বিপদ এবং দুঃখ একই সাথে আসে।

৬.৪ কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার বাড়িতে ৩/৪ বছর বয়সের কোনো শিশু আছে? থাকলে (না থাকলে অন্য বাড়ির) তার আধো-আধো কথাগুলো মন দিয়ে শোনার ও বোঝার চেষ্টা কর। দেখবে সে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে তার মনের সকল ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। সেগুলো তোমার কাছে অসংলগ্ন বা এলোমেলো ও হাস্যকর মনে হবে। তার এই এলোমেলো কথাগুলো তোমার বিবেচনায় বাক্যের কোনো গুণ বা লক্ষণ ব্যাহত করেছে? আধো-আধো কথা বলা কোনো শিশুর কিছু অসংলগ্ন হাস্যকর কথার উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। (এটি একটি দলবদ্ধ কাজও হতে পারে।)
২. একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে এমন দশটি বাক্য লেখ। এরপর সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যটির কোনো অংশকে জটিল বাক্যে রূপান্তর কর। তারপর যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগে বাক্যটিকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর কর। যেমন :

তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয় নি।

জটিল বাক্য : তার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয় নি।

যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

৩. নিচের বাক্যগুলোতে গঠনগত দিক থেকে কোন কোন গুণের অভাব ঘটেছে খাতায় লেখ :
 - ক. কাল আমি যাব ট্রেনে বাড়ি করে।
 - খ. সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়।
 - গ. মন দিয়ে কর সবে...।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিরামচিহ্ন

৭.১ বিরামচিহ্ন

৭.২ কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার

৭.৩ কর্ম-অনুশীলন

৭.১ বিরামচিহ্ন

মানুষ একটানা কথা বলতে পারে না। তাই তাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়। তা ছাড়া অন্যকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়। কথা থামাতে হয় শ্বাস নেবার জন্য। লেখা থামাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় নানা রকম চিহ্ন বা সংকেত। এই চিহ্ন বা সংকেতই বিরামচিহ্ন। একে যতি বা ছেদ-চিহ্নও বলা হয়ে থাকে। বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাকে বিরামচিহ্ন বলে।

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিরামচিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো :

বিরামচিহ্নের নাম	আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	
জিঞ্জাসাচিহ্ন	?
বিষয়চিহ্ন	।
কোলন	:
কোলন ড্যাশ	:-
ড্যাশ	-

হাইফেন	-
উন্ধরণচিহ্ন / উন্ধৃতিচিহ্ন	“ ”
বন্ধনী চিহ্ন	(), { }, []
বিকল্প চিহ্ন	/
ইলেক / লোপচিহ্ন / উর্ধ্বকমা	'

উল্লিখিত বিরামচিহ্নগুলোর মধ্যে কিছু চিহ্ন বস্তার মনোভাবের সমাপ্তি বোঝাতে বাক্যের শেষে বসে। কিছু চিহ্ন বস্তার মনোভাবের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে বাক্যের মধ্যে বসে।

বাক্যের শেষে ব্যবহৃত বিরামচিহ্নগুলো হচ্ছে : দাঁড়ি () , জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) ও বিশ্বায়চিহ্ন (!)।

দাঁড়ি ()

বস্তার বা লেখকের মনোভাবের সমাপ্তি বোঝাতে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচেদ বসে। যেমন :

আমরা বাংলাদেশে বাস করি।

জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?)

বস্তার মনে কোনো কিছু জানার আগ্রহ জন্মালে তা জানতে বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসাচিহ্ন বা প্রশ্নচিহ্ন বসে।
যেমন :

তোমার নাম কী?

বিশ্বায়চিহ্ন (!)

বস্তার মনের বিভিন্ন আবেগ যেমন : আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, তয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করতে এবং সম্বোধন পদের পরে বিশ্বায়চিহ্ন বা সম্বোধনচিহ্ন বসে। যেমন :

১. আহা! কী সুন্দর দৃশ্য!
২. মাগো! তুমি কথন এলো!

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিরাম-চিহ্নগুলো হচ্ছে : কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), হাইফেন (-), ত্যাশ (-), উর্ধ্বকমা ('), উন্ধৃতিচিহ্ন (“ ”), বিকল্প চিহ্ন (/)।

৭.২ কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার

কমা (,)

বাক্যে অল্প বিরতি বোঝাতে কমা বসে। নানা প্রয়োজনে বাক্যে কমাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. বাক্যের অর্থ সংষ্ট করার জন্য কমা বসে। যেমন :

তুমি যাবে, না যাবে না?
সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

২. বাক্যে সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন :

সেভু, পড়তে বসো।
বিথু, খাবে এসো।

৩. একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা বসে। যেমন :

বিশেষ্য : পঞ্চা, মেঘনা, যমুনা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী।

বিশেষণ : সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা একই মালার ফুল।

সর্বনাম : তুমি, আমি ও রবিন বাজারে যাব।

৪. একই ধরনের একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশকে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন :

শ্রেষ্ঠা ক্লাসে চুক্ল, বই রাখল, তারপর বেরিয়ে গেল।
আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ খুবই আনন্দের দিন।

৫. বাক্যে উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন :

মা বললেন, “অঙ্ক করতে বসো।”
আমি বললাম, “গল্পের বই পড়তেই ভালো লাগছে।”

সেমিকোলন (;)

একাধিক বাক্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলে তাদের মাঝে যোগসূত্র রক্ষার জন্য সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। সেমিকোলনচিহ্ন কমার চেয়ে দ্বিগুণ সময় বিরতি নেয়। যেমন :

১. দুটো বাক্যের মধ্যে ভাব বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

দিনটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে বৃক্ষ পড়ছে।
কথাটা বলা সহজ; করা কঠিন।

২. একাধিক বাক্য সম্বয়ের দ্বারা যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

আগে স্কুলের পড়া; পরে গল্পের বই।

৩. যেসব অব্যয় বৈপরীত্য বা অনুমান প্রকাশ করে, তাদের আগে সেমিকোলন বসে। যেমন :

মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলেই ভালো ফল করবে।
ছেলেটি মেধাবী; কিন্তু ভারি অলস।

কোশন (:)

বাক্যে নানা কারণে কোশনচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে :

বাংলা সম্বিধান দু প্রকার : স্বরসম্বিধান ও ব্যঙ্গসম্বিধান।

২. উদ্ধৃতির আগে :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে।”

৩. নাটকের সংলাপের আগে :

দুকড়ি : কী চাই?

কাঙালি : আজ্জে, মহাশয় হচ্ছেন দেশহিতৈষী।

দুকড়ি : তা তো সকলেই জানে কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি : আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

হাইফেন (-)

হাইফেনকে বাংলায় সংযোগ চিহ্ন বলা হয়। বিভিন্ন কারণে বাক্যে হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন :

১. দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে। যেমন :

আমার মা-বাবা বেড়াতে গেছেন।

পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ বিবেক দিয়ে বুবাতে হয়।

২. সমাসবন্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন বসে। যেমন :

আমাদের প্রীতি-উপহার গ্রহণ করুন।

তাদের মধ্যে অহি-নকূল সম্পর্ক।

৩. একই ধরনের শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে। যেমন :

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ।

ঢাকা-খুলনা-বরিশাল এ দেশের বড় শহর।

৭.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরামচিহ্ন বসাও :

- ক. আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা হাতপাখা ফুলপিঠা তৈরি করা হয় তা মোটেই অবহেলার সামগ্রী নয়
- খ. যুবক বলিল কি সে কাজ আমি কি তাহা জানিতে পারি না কৃপা করিয়া আমাকে তাহা জানিতে দাও
অভিন্ন হৃদয় সুহৃদের ন্যায় প্রাণ দিয়াও আমি সে কার্যে তোমার সহায়তা করিব
- গ. মুক্তি বলল স্যার বলেছেন আজ ক্লাসে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা নিয়ে গল্প শোনাবেন
আমি বললাম তিনি কি কোনো বই পড়ে আসতে বলেছিলেন
মুক্তি বলল তুমি গত ক্লাসে আসনি কেন ক্লাস না করলে কত কথা জানা যায় না বুঝেছ
আমি উত্তর দিলাম সে দিন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম
এবার মুক্তি বলল স্যার আজ আমাদের কোনো বই পড়ে আসার কথা বলে দেন নি

২. বাক্যে কোথায় কোথায় ড্যাশ ও হাইফেন বসে দৃষ্টান্তসহ উপস্থাপন কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বানান

৮.১ বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

৮.২ কর্ম-অনুশীলন

৮. বানান

তাষা শুল্কগুপ্ত লিখতে হলে সে ভাষার বানান জানা খুব জরুরি। প্রত্যেক ভাষারই বানানের নিয়ম আছে। বাংলা ভাষার বানানেরও বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আধুনিক করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণভাবে মান্য করা হয় বাংলা একাডেমি অনুমোদিত বানানরীতি। নিচে বাংলা বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম দেখানো হলো।

৮.১ বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

ক. বানানে ই, ঈ, উ-এর ব্যবহার

১. যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর (ই ঈ, উ উ) অতিথানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অতৎসম (তৎব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র) শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর (ই ী, উ ু) হবে। যেমন :

তৎসম শব্দে :

অজ্ঞানি, অটবি, আবির, আশিস্, উষা, কিংবদন্তি, কুটির, গাঁড়ি, গ্রন্থাবলি, চিৎকার, তরণি, তরি, দেশি, পদবি, বিদেশি, ভু, শ্রেণি, সারণি।

অতৎসম শব্দে :

আদমি, আপিল, আমিন, আলমারি, উকিল, উর্দু, কাজি, কারবারি, কারিগরি, কুমির, কেরানি, শ্রিষ্ট, শ্রিষ্টান্দ, গরিব, গাজি, গাড়ি, গিন্নি, চাকরি, জরুরি, জানুয়ারি, ডিপ্রি, দরকারি, দাবি, দিঘি, ধূলো, নার্সারি, পড়শি, পদবি, বাড়ি, ঝাঁশি, বাঙালি, বে-আইনি, ভূতুড়ে, মিস্ত্রি, মুলো, মেয়েলি, যিশু, রেশমি, লটারি, লাইব্রেরি, শাশুড়ি, শিকারি, সবজি, সরকারি, সুনি, হাজি, হিজারি।

২. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ই-কার হবে। যেমন :

অতিনেত্রী, কঢ়ী, কল্যাণী, কিশোরী, গাভী, গুণবত্তী, চঙ্গী, চতুর্দশী, ছাত্রী, জননী, তরুণী, দাসী, দুঃখিনী, দেবী, নারী, পঞ্জী, পিশাচী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, মাতামহী, মানবী, যুবতী, লক্ষ্মী, শ্রীমতী, সতী, সরমতী, হরিণী, হৈমতী।

৩. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার হবে। যেমন :

আফগানি, আরবি, ইংরেজি, ইরাকি, ইরানি, ইহুদি, কাশ্মিরি, জাপানি, তুর্কি, নেপালি, পাকিস্তানি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, বাঙালি, সাঁওতালি, সিন্ধি, হিন্দি।

৪. বিশেষণবাচক ‘আলি’-প্রত্যয়ুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন :

চৈতালি, পুবালি, বর্ণালি, মিতালি, মেয়েলি, বুপালি, সোনালি।

খ. বানানে ও-এর ব্যবহার

১. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার (১) অপরিহার্য নয়। যেমন :

আনব, করত, খেলব, চলব, দেখত, ধরব, নাচব, পড়ব, বলত, মরব, মরাব, লড়ব, শিখব।

২. বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্যরূপে পদান্তে ও-কার প্রদান করা যায়। যেমন :

আনো, করো, খেলো, চলো, দেখো, ধরো, নাচো, পড়ো, বলো, মারো, লড়ো, শেখো।

৩. ‘আনো’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :

করানো, খাওয়ানো, ঠ্যাঙ্গানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, শোয়ানো।

৪. অর্থ বা উচ্চারণ বিভিন্নির সুযোগ থাকলে কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে ও-কার দেওয়া আবশ্যিক।

যেমন :

কাল (সময়), কালো (কৃষ্ণ বর্ণ);

কোন (কী, কে, কোনটি), কোনো (বহুর মধ্যে এক);

ভাল (কপাল), ভালো (উত্তম)।

গ. বানানে বিসর্গ (৪)-এর ব্যবহার

১. পদান্তে বিসর্গ (৪) থাকবে না। যেমন :

ক্রমশ, দ্বিতীয়ত, প্রথমত, প্রধানত, বস্তুত, মূলত।

২. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন :

অন্তঃস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, নিঃশব্দ, পুনঃপুন, স্বতঃস্ফূর্ত।

৩. অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন :

দুষ্ট, নিশাস, নিস্তুহ, বহিস্থ, মনস্থ।

ঘ. বানানে মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার

১. যুক্তব্যঞ্জনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গীয় বর্ণের (ট ঠ ড ঢ) পূর্ববর্তী দন্ত্য-ন ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
কটক, ঘটা, নির্ষট, বটন, অকৃষ্ট, আকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, উপকৃষ্ট, কৃষ্ট, কৃষ্টনালি, লুষ্টন, অকালকুষ্মাণ্ড, অণ্ড,
কাণ্ড, কাণ্ডারী, কুণ্ডল, খণ্ড, চঙ্গী, দণ্ড, পণ্ডিত, ভণ্ড, ভণ্ডামি।

২. তৎসম শব্দে ঝ, ঝ-কার (ঝ), র, র-ফলা (ঝ), রেফ (ঝ'), ষ, ষ্ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
ঝণ, তৃণ, অরণ্য, ত্রাণ, বৰ্ণ, বিদূষণ, বিশেষণ, ক্ষণ, ক্ষণিক।

৩. একই শব্দের মধ্যে ঝ, ঝ-কার, র, র-ফলা, রেফ, ষ, ষ্ষ-এর যে কোনোটির পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ
এবং য, য়, হ, অনুস্বার (ঁ), — এই বর্ণগুলোর একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও পরবর্তী ন-ধ্বনি
মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

কৃপণ, নিরূপণ, অগ্রহায়ণ, অকর্মণ্য, নির্বাণ, সর্বাঙ্গীণ, অপেক্ষমাণ, বক্ষ্যমাণ।

৪. প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পর নম্, নশ্, নী, নু, অন্, হন্ প্রত্তি ধাতুর দন্ত্য-ন স্থলে
মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

প্র : প্রণাম, প্রণব, প্রণীত, প্রণিপাত;

পরা : পরায়ণ, পরাত্ম;

পরি : পরিণতি, পরিণাম, পরিণয়;

নির : নির্ণীত, নির্ণয়, নির্ণায়ক।

৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (অতৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

ইন্টার, উইন্টার, কারেন্ট, গ্র্যান্ট, টেভার, প্যান্ট, ব্যান্ড, লেন্ড, সেন্ট্রাল।

৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

অন্ত, অন্তরঙ্গ, একান্ত, ক্লান্ত, জ্বলন্ত, মন্ত্রী, গ্রন্থ, পান্থ, অনিন্দ্য, পরান্ত, প্রচন্দন, রান্না, সান্নিধ্য।

৭. সম্বিধ ও সমাসযোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্ত্য-ন বহাল থাকে। যেমন :

অগ্রন্যায়ক, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিত্রাঙ্গকন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, নির্নিমেষ, শিক্ষাঙ্গন।

৮. তৎব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সর্বত্র দন্ত্য-ন হবে। যেমন :

আপন, আয়রন, কুর্নিশ, কোরান, গ্রিন, চিরুনি, ঝারনা, ধরন, বার্নিশ, মেরুন, লঞ্চন, শিহৱন, হৰ্ণ।

ঙ. বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর ব্যবহার

১. ষ- কিংবা ষ-কার (‘)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ষষ্ঠি, কৃষি, কৃষক, কৃষণ, ত্বষ্টি, দৃষ্টি, সৃষ্টি, হৃষ্টচিন্ত।

২. র-ধ্বনি রেফ (‘)-এর রূপ নিয়ে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বসলে ঐ ব্যঞ্জনের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, বিমর্শ, মুমূর্শ, শীর্ষ, সম্ভর্ষি, হর্ষ।

৩. অ, আ ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ এবং ক, র বর্ণের পরবর্তী দত্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ঈষৎ, উষা, এষণা, কোষ, জিগীষা, বিষম, ভবিষ্যৎ, রোষ, সুষমা।

৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

সঞ্চা > অনুসঞ্চা, সেক > অভিষেক, স্থান > অধিষ্ঠান, সুপ্ত > সুষৃপ্ত।

৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

অনিষ্ট, অষ্টম, আড়ষ্ট, উচ্ছিষ্ট, উপদেষ্টা, কষ্ট, চেষ্টা, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠা, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সুষ্ঠু।

৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দত্ত্য-স হয়। যেমন :

অধ্যস্তন, ইষ্টফা, উদ্বাস্তু, ওস্তাদ, কস্তুরি, কাস্তে, জবরদস্তি, স্থান, স্থানীয়, স্বাস্থ্য।

৭. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) চ-বর্গের পূর্বে তালব্য-শ হয়। যেমন :

আচর্য, দুচরিত্রি, নিষ্ঠয়, পশ্চাত, প্রায়শিত্ত, বৃচ্ছিক, নিষ্ঠিদ্ব।

চ. বানানে রেফ (‘)-এর ব্যবহার

রেফ-এর পর কোথাও (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতী হবে না। যেমন :

কর্জ, কর্ম, কার্য, পূর্ব, ফর্দ, মর্মর, শর্ত, সূর্য।

ছ. বানানে ঙ / ৎ-এর ব্যবহার

১. সম্বিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে মুঠাকলে ক-বর্গের পূর্বে মুঠানে ৎ (অনুস্বার) হবে। যেমন :

অহংকার (অহম + কার), কিংকর, কিংবদন্তি, ঝংকার, ভযংকর, সংকল, সংকীর্ণ, সংগীত, সংযথ, সংযাত, হুংকার।

২. উপর্যুক্ত নিয়মে সম্বিজাত না হলে, যুক্তব্যঞ্জনে ক-বর্গের পূর্বে মুঠানে ঙ (উঁয়োঁ) হবে। যেমন :

আকাঙ্ক্ষা, অঙ্কুর, অঞ্জ, ইঞ্জিত, উচ্চুঙ্খল, কঙ্কাল, কাঙ্ক্ষিত, গঞ্জা, জঞ্জি, দাঙ্গা, পঞ্জজ, পঞ্জু, বঞ্জা, ভঞ্জি, লঞ্জন, শিঙ্কাঙ্জান, সঞ্জী।

৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে ১ (অনুস্বার) ব্যবহৃত হয়। যেমন :

আড়ৎ, ইদানীৎ, এবৎ, ঠ্যাং, ঢৎ, পালৎ, ফড়ৎ, বরৎ, রং, শিৎ।

৪. তবে অনুস্বারযুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে ১ স্থলেও দেখা হবে। যেমন :

আড়ঙ্গে, টঙ্গে, ঢঙ্গে, ফড়ঙ্গের, রঙ্গিন, রাঙ্গিয়ে, সঙ্গের।

৮.২ কর্ম-অনুশীলন

১. আসাচে বৃষ্টি হয়। অতি বৃষ্টির পাশি পরিনামে বয়ে আনে বন্যা। লোকের কস্ট বাড়ে। দেখা দেয় বিভিন্ন রোগের প্রদুঃভাব। চলাচল দুর্কর হয়ে পড়ে।
—এই বাক্যগুলো থেকে ভুল বানানগুলো খুঁজে বের কর। সেগুলো কোন কারণে ভুল তা উল্লেখ করে শুধু বানান লেখ।
২. তোমার পাঠ্যবইয়ের যে-কোনো একটি গঞ্জ খুব তালো করে পড়। তারপর গঞ্জটি থেকে যেসব বানানে ই, উ-কার এবৎ যেসব স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ-কার পাওয়া যায় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। (এটি তুমি একটি গ্রুপ তৈরি করেও করতে পার।)

নবম পরিচ্ছেদ

অভিধান

- ৯.১ বর্ণানুক্রম
- ৯.২ ভূক্তি ও শীর্ষ শব্দ
- ৯.৩ কর্ম-অনুশীলন

৯. অভিধান

ইংরেজি Dictionary শব্দটির বাংলা অর্থ ‘অভিধান’। অভিধান হলো ভাষার সেই গ্রন্থ, যা থেকে এই ভাষার শব্দসমূহ, শব্দের অর্থ, উৎস, ব্যৃত্পত্তি, পদ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। অভিধান জানিয়ে দেয় শব্দের শুন্ধ রূপ কোনটি, শুন্ধ বানান কোনটি, শুন্ধ অর্থ কোনটি। অভিধান মানেই হচ্ছে শুন্ধতার প্রতীক। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই অভিধান বা শব্দ কোষ আছে। বাংলা ভাষায়ও সংকলিত হয়েছে সমৃদ্ধ অভিধান।

৯.১ বর্ণানুক্রম

অভিধানে শব্দের পর শব্দ সাজানো থাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে। প্রথমে অ দিয়ে যেসব শব্দের বানান শুরু, সেগুলো। তারপর আ দিয়ে, তারপর ই দিয়ে; এভাবে বর্ণের ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে অভিধান। তবে সাধারণভাবে বর্ণের যে ক্রম মান্য করা হয় তা থেকে অভিধানে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিচে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দের বর্ণানুক্রম দেখানো হলো।

সাধারণ বর্ণানুক্রম

অ আ ই ঈ উ ঊ খ এ ঐ ও উ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এও
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ত ম য র ল শ ষ স
হ ড় ঢ় য এঁ ইঁ

অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রম

অ আ ই ঈ উ ঊ খ এ ঐ ও উ ইঁ
ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এও

ট ঠ ড ড় ঢ চ ণ ত (১) থ দ ধ ন
প ফ ব ত ম য য র ল শ ষ স হ

যুক্তাক্ষরের বর্ণনুক্তি

ক ষ্ট ক্ত ক্ষ ক্স গ্র গ্র জ্ঞ জ্ঞ ঝ্য ঝ্য
চ ছ ছ্যও জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ প্র প্র প্র এও
উ উড ডুগ ষ্ট ষ্ট ষ্ট প্র প্র ম্ম ম্ম থ
দ্বা দ্ব দ্ব দ্ব দ্ব দ্ব দ্ব দ্ব দ্ব ন্চ
ন্ত
শ্ব ব্ব
ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড ল্ড
ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব ম্ব

কারচিহ্ন । পী ১৯৮৫ চৈ ৮০ ৮০

ফলাচিহ্ন ৬ ম ৩ ৫ ল ব

স্বরবর্ণ, কারচিহ্ন, অনুস্মার, বিসর্গ ও চন্দ্ৰবিদ্যুৱ বিন্যাসেৱ নমুনা

ক কজ কআ কই কই কট কট কৰা কএ কঠ কও কও কং কঃ কঁ কঁক কঁখ ...
কা কাজ কআ কাই কাই কাউ কাউ কাখ কাএ কাও কাও কাং কাঃ কঁাক কঁাখ...

১.২ ভুক্তি ও শীৰ্ষ শব্দ

অভিধানে যে শব্দেৱ অৰ্থ দেওয়া হয়, সেটি বোল্ড টাইপে বা মোটা হৱফে মুদ্ৰিত থাকে। এটিকে শীৰ্ষ শব্দ বলে।

যেমন :

অঞ্চলী [অৱিনি] বিশ খণ্মুক্ত; খণ্মূল্য। {স. অ+খণ+ইন(ইনি); স. অন্গী}

—এখানে ‘অঞ্চলী’ শব্দটি হচ্ছে শীৰ্ষ শব্দ।

অভিধানে শীৰ্ষ শব্দেৱ অৰ্থ, ব্যাখ্যা ও ব্যবহাৱ যেভাবে বিধৃত থাকে তাকে বলা হয় ভুক্তি। শীৰ্ষ শব্দগুলো যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, সেজন্যে অভিধানে শব্দগুলোকে বৰ্ণনুক্তিমিবভাবে সাজানো থাকে। বাংলা একাডেমি যে “অভিধান ব্যবহাৱ নিৰ্দেশিকা” প্ৰণয়ন কৱেছে তা এ রকম :

অভিধান ব্যবহাৱ নিৰ্দেশিকা

এ অভিধানে শব্দেৱ উচ্চারণ, অৰ্থ, পদ পৰিচয়, অৰ্থাত্তৱ, প্ৰয়োগ, ব্যৎপত্তি প্ৰভৃতি কীভাবে নিৰ্দেশ কৱা হয়েছে নিম্নলিখিত নিৰ্দেশিকায় তা পৰিস্কৃত কৱাৰ চেষ্টা কৱা হলো :

<p>অবশিষ্ট [অবেশিষ্ট] বিশ ১ বাকি। ২উচ্চ। ৩ অতিরিক্ত। {স. অব+শিষ্ট+ত(ক্ত)}</p>	<p>শীর্ষশব্দ উচ্চারণ</p> <p>সাধারণ অর্থ</p>
--	---

<p>খেত, ক্ষেত [খেত] বি মাঠ; চামের জমি; সমোগোদনের মাঠ (চাম তারা, ফসলের খেত, দৌধি ও খামার— বিদে) ~যোলা, ~খামার বি আবাদি জমি; চাঁদির কর্মসূক্ষ্মা (এক পেলাস চাঁড়ল—পানি ধাইয়া খেত- যোলা দেখিতে বাহির হওয়া গুস্মান সরকারের অনেক দিনের অভ্যাস—আমজ্ঞা) খেতালি, খেতি, ক্ষেতি বি ১ চাম-আবাদ (...বিদিয ক্ষেত ক্ষেতি শোভয়— দোবা)। ২ ক্ষেত কর্মসূক্ষ্মের বা চাম-আবাদের কাজ। {স. ক্ষেত>প্রা. খেত>খেত}</p>	<p>বিকল্প শীর্ষশব্দ পদ পরিচয়</p> <p>উপভূক্তি</p> <p>প্রয়োগবাক্য</p>
--	---

<p>তরঁ। [তর] বিশ ১ বিতোর; নিয়ন্ত; চূর (এই শরাবের পিয়ালা দিয়ে তর করি দিল—নই)। ২ জলসিঙ্গ; ডিজে যাওয়া (ভিজে তর হয়ে যাওয়া)। {ফ. তৱ্-ৰঁ } তরঁ। [তর] বি বিলৎ; দেরি; অপেক্ষা (তর সহেক একটি তিল—আমোক); তর সয় না বৰ, দিনেই বিয়া কর—চূড়া)। {স. দুরাৰু } তরঁ। তরো। [তরো] বিশ ধূকারের; ধৰনের; শ্রেণির (কেমেন্টের লোক)। তরো—বেতরো বিশ বিভিন্ন ধূকারের; নানা ধৰনের; হৰেক রকম (আলোর নিশেন কুলছে—চোকো লম্বা চওড়া সুসু তরো—বেতরো— অষ্টা)। বে~ বিশ খারাপ ধৰনের; খারাপ; দুষ বেয়াড়া। {আ. তৱহ তৱহ }</p>	<p>অভিভ্র বানানের একাধিক ভূক্তি</p> <p>বৃংগপতি</p>
--	--

অধীন। [অধিন] বিশ ১ আয়ত; বশীভূত (আজ্ঞার অধীন)।
২ অন্তর্ভুক্ত; অন্তর্ভুক্ত (শাসনের অধীন)। ৩ অনুগত;
বাধ্য (অধীন জন)। □বি ১ অধীন বাস্তি (অধীনের
বিনোদ নিবেদন)। ২ নিয়ন্ত্রণ; তত্ত্বাবধান (তাঁর অধীনে
আমি কাজ করি)। অধীনতা বি আজ্ঞানুবর্তিতা;
পরাধীনতা। অধীনী, অধিনী, অধীনী বিশ আপ্রিতা;
বশীভূতা; অনুগতা (তুমি নব জলধর এ তব অধীনী—
মদ, তাইতে কাদায় নিশিদিনই এ অধীনী—নই)।
(স. অধি + ইন(থ))

প্রত্যয়
উৎস- ভাষা নির্দেশ

দর্জি → দরজি

ব্রহ্মবৃক্ষ

নিদ = নিদ্রা

অভিন্নতা নির্দেশক

বানানো। [বানানো] ক্রি ১ তৈরি করা; গড়া; প্রস্তুত করা
(বাড়ি বানানো শেষ হয়েছে)। ২ রৌপ্য (কুটি বানানো;
কোর্মা বানানো)। ৩ রৌপ্যবার জন্য কোনো কিছু কেটা
(মাঝে বানানো, তরকারি বানানো)। ৪ কোনো কিছুর
সঙ্গে তুল্য জন্য করা (ভেড়া বানানো)। ৫ কিছুতে
পরিষ্কৃত করা (নোকা বানানো)। □বিশ কৃতিম; মিষ্টা।
(তুল. হি.বানান; তিমির রূপ—বানাই, বানাও, বানান,
বানানে, বানিয়ে ইত্যাদি; অসমাপিকার রূপ—বানিয়ে
বালাতে ইত্যাদি)

তিমির রূপ

পরপদ। [পৰোপদ] বি ১ শ্রেষ্ঠ হান; পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ।
২ মোক্ষ। ৩ (যা.) সমাসে সহস্যমান পদদুটোর মধ্যে
পরেরটি বা হিতীয়টি (শ্রেষ্ঠন—এখানে ‘ধন’ হিতীয়
পদ)। {স. পৰ+পদ; ৬০৮ }

বিষয় নির্দেশ

ব্যাকরণ নির্দেশ

৯.৩ কর্ম-অনুশীলন

- তোমার হাতের কাছে যে অভিধান আছে সেটি দেখে ‘কিংকর্তব্যবিমুচ্ত’, ‘দেউলিয়া’, ‘রকমারি’ ও ‘সরঁ’ শীর্ষ শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও ব্যবহার সেখ।
- হিসাব, হিস্সা, আছাড়, আচ্ছাদক, খাকি, খাটি, ড্রপার, ড্যাশ, উৎপাদন, উত্তরাই, চিরুনি, চিরায়, সাম্য, সামান্য, ফলদ, ফলার, ইক্সু, ইন্দুর, প্রসাধন, প্রশারা – শব্দগুলোকে অভিধানের মতো বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজাও।

দশম পরিচ্ছেদ

শব্দার্থ

- ১০.১ একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা
- ১০.২ সমার্থক শব্দের প্রয়োগে বাক্য রচনা
- ১০.৩ বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা
- ১০.৪ বাগধারা
- ১০.৫ কর্ম-অনুশীলন

১০. শব্দার্থ

অর্থপূর্ণ শব্দের দ্বারা মানুষ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করে। আর অর্থ হচ্ছে শব্দের প্রাণ।

ভাষার ভাব (বাক্য, বাক্যাংশ, বৃপ্তি, শব্দ, বাগধারা ইত্যাদি) যখন ইঞ্জিয় (প্রথানত চোখ, কান) গ্রহণ করে এবং তার উপরে যে মানসিক ধারণা জন্মায়, তখন তাকে শব্দার্থ বলে।

নানা কারণে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। নিচে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

১০.১ একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা

বাধ্যায় কতগুলো শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ, বিশেষণ ও ক্রিয়া জাতীয় এই পদগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলো একদিকে যেমন একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি বাক্যের সৌন্দর্য সাধন করে থাকে। যেমন :

১. কথা

উক্তি : রবীন্দ্রনাথের কথা, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।’

তর্ক : এই ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে।

প্রতিশ্লুতি : তোমাকে আমি কথা দিলাম।

প্রস্তাব : তোমার কথায় আমি রাজি।

তিরস্কার : পড়া না পারায় স্যারের কাছে কথা শুনতে হলো।

প্রসঙ্গকর্ম : কথায় কথায় তোমার নামটি এসে গেল।

২. কান

- শ্রবণ অঙ্গ : নোভা কানে দুল পরেছে।
 বধির : লোকটি কানে শোনে না।
 কর্ণগোচর : কথাটা বড় সাহেবের কানে পৌছেছে।
 মনোযোগ : আমার কথায় কান দাও।
 প্রকাশ : কথাটা পাঁচ কান করো না।
 নির্জন্জ : সানুর মতো দুকান কাটা লোক আর দেখি নি।

৩. কাঁচা

- অপকৃত : আমটি কাঁচা হলেও বেশ মিষ্টি।
 অসিদ্ধ : কাঁচা দুধ সবার হজম হয় না।
 অপূর্ণ : আমার কাঁচা ঘুমটি ভাঙালে কেন?
 অদক্ষ : কাঁচা লোক দিয়ে বাড়ি বানিয়ো না।
 অশুষক : কাঁচা কাঠে আগুন জ্বলে না।
 অপরিগত : এই শক্ত কাজের জন্য ছেলেটি বড় কাঁচা।
 দুর্বল : ছেলেটি অঙ্গে কাঁচা।

৪. কাটা

- ক্ষত : কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিও না।
 নষ্ট : পোকায় কাটা বহিগুলো আর পড়ার মতো নেই।
 ছুরি : পরের গাঁট কাটা ওর স্বত্ত্বাব।
 ছোবল : সাপে কাটা লোকটিকে সবাই দেখতে এসেছে।
 ছন্দপতন : তাল কাটা গান শুনতে ভালো লাগে নাকি?

৫. খাওয়া

- তোজন : আমার খাওয়া হয়েছে।
 ঘূষ : মনির সাহেবকে সবাই টাকা খাওয়া অফিসার হিসেবেই চেনে।
 বাধা : কাজের শুরুতেই ধাক্কা খাওয়া ভালো লক্ষণ নয়।
 দিবিয় : মাথা খাও, এখন যেও না।
 তিরস্কার : শিক্ষকের কাছে ধর্মক খাওয়া বিধুর নিত্যদিনের অভ্যাস।
 মানিয়ে চলা : সংসারে সবার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

৬. গরম

- উষ্ণ : এক কাপ খুব গরম চা দাও।
 গ্রীষ্ম : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গরমকাল।
 উগ্র : তোমার গরম মেজাজকে আমি ভয় পাই না।
 অহংকার : দু নম্বরি টাকার গরমে রাহিমের পা যেন মাটিতে পড়ে না।
 চড়া : সরবরাহ কম থাকলে বাজার গরম থাকে।
 শীত নিবারক : শীতকালে গরম কাপড় না হলে চলে না।

৭. গা

- শরীর : রোমানার গায়ের রং ফর্সা।
 গ্রাহ্য : তার কোনো কথাই আমি গায়ে মাথি না।
 স্রষ্টা : পরের ভালো দেখলে রোজিনার গা জুলে।
 পরিধান : গায়ে নতুন জামা দেখছি, কবে কিনলে?
 আআগোপন : পুলিশ দেখে চোরটি গা-চাকা দিল।
 অভ্যস্ত : মাস্তানদের দৌরাত্য এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

৮. গলা

- গ্রীবা : চিড়িয়াখানায় লম্বা গলার জিরাফ দেখেছি।
 কঙ্গ : তার সুরেলা গলার গান তোলা যায় না।
 প্রতির ভাব : ওদের দুজনের বেশ গলায় গলায় ভাব।
 অতি বিনয় : গলবস্ত্র হয়ে রতনবাবু সাহায্য চাইলেন।
 বোঝা : পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।
 অপমান : লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।

৯. চাল

- তঙ্গুল : ঘরে চাল বাড়ত, খাবে কী?
 ঘরের ছাদ : ফুটো চাল দিয়ে বৃক্ষির পানি পড়ে।
 আচার-ব্যবহার : তার চাল চলন মোটেই ভালো নয়।
 মতলব : সেলিম খুব গভীর জলের মাছ, তার চাল বোঝা কঠিন।
 আড়ম্বর : রাহিমের বাইরেই যত চাল, ভেতরে একেবারেই ফঁপা।
 ঘর-সংস্কার : চাল-চুলোর ঠিক নেই, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

১০. চোখ

- আঁখি : আমরা চোখ দিয়ে দেখি।
 দৃষ্টি : পুলিশের চোখ আসামির দিকে।
 ফাঁকি : চোরাটি পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল।
 রোগ : রফিকের চোখ উঠেছে বলে তীব্র কফে আছে।
 ভয় দেখানো : আমাকে চোখ রাঞ্জিয়ে লাভ হবে না।
 লজ্জা : তোমার চোখের চামড়া থাকলে আর আমার সামনে আসতে না।

১১. ছেট

- কনিষ্ঠ : রবিন আমার ছেট ভাই।
 নীচ : তোমার মতো ছেট মনের মানুষ আমি আর দুটো দেখি নি।
 হীন : ছেট কাজ বলে কিছু নেই।
 বিনীত : বড় যদি হতে চাও, ছেট হও তবে।
 হেয় করা : জাতের কথা বলে কাউকে ছেট করা ঠিক না।

১২. ছাড়া

- ত্যাগ : তার মতো সৎসার ছাড়া নেক আমি আর দেখি নি।
 মুক্তি : মাসুম আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।
 শ্রীহীন : লক্ষ্মীছাড়া সৎসারে ভালো কিছু চিন্তা করাই ভুল।
 উচ্চস্বরে : গান শিখতে হলে ছাড়া গলায় প্রতিদিন রেওয়াজ করতে হবে।
 ব্যতীত : সত্ত্বের পথ ছাড়া মুক্তি নেই।

১৩. তাল

- তবলার বোল : তবলায় তাল বেজেছে তাক ধিনা ধিন্ ধিন্।
 ছন্দহীন : তাল কাটা গান ভালো লাগে না।
 ফল বিশেষ : ‘তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে, উকি মারে আকাশে।’
 ধীরে : বাঢ়ি তৈরির কাজ তিমা তালে চলছে।
 মানিয়ে চলা : সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার মেয়ে মিনি নয়।

১৪. তোলা

- উদ্ভোলন : ব্যাংক থেকে টাকা তোলা হয়েছে।
 উথাপন : কথাটা আমার তোলার কথা না, তুমি বল।
 সঞ্চাহ : সরকার যেকোনো ধরনের চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ করেছে।
 ছেঁড়া : গাছ থেকে ফুল তুলো না।
 গ্রাহ্য করা : সে আমার কথা কানেই তুলল না।

১৫. ধরা

- আটক : চোরটাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।
 স্পর্শ : তোমার হাতখানা একবার ধরতে চাই।
 ভালো লাগা : তার গঞ্জটি আমার মনে ধরেছে।
 নির্ধারণ : ভূমি নিজে থেকে একটা দাম ধরে দাও।
 তোষামুদ্দে : সৎসারে ধামাধরা লোকের অভাব নেই।
 যন্ত্রণা : মাথাটা বজ্জ ধরেছে।

১৬. নাক

- নাসিকা : তিসা নাকে নথ পরেছে।
 শব্দ করা : ঘুমের মধ্যে অনেকেই নাক ডাকে।
 নিষ্ঠিত : পরীক্ষা শেষ, এবার নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।
 ক্ষতি : নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে তোমার কী লাভ হলো?
 অনধিকার চর্চা : আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

১৭. নাম

- পরিচয় : তোমার নাম কী?
 খ্যাতি : ফ্রিকেট খেলে রাজন বেশ নাম করেছে।
 খ্যাতিমান : তিনি একজন নামকরা উকিল।
 অরণ : সব সময় সৃষ্টিকর্তার নাম নেবে।
 সম্মূল্য : নামমাত্র দামে বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল।
 উল্লেখ : একটা নদীর নাম বল।

১৮. পাকা

- পরিপন্থ : আমাটি পাকা।
 অকলপন্থ : ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু কথায় পাকা।
 নিপুণ : মিনা ইংরেজিতে পাকা।
 দক্ষ : পাকা মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ি বানিয়েছি।
 স্থায়ী : কাপড়টির রং পাকা।
 পুরোপুরি : পাকা চালিশ দিন স্কুল ছুটি।

১৯. বড়

- অগ্রজ : রাম আমার বড় ভাই।
 দীর্ঘ : পদ্মা বাংলাদেশের বড় নদী।

- ধনী** : লোকমান সাহেব বড়লোক।
অত্যন্ত : বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।
উন্নতি করা : বড় হও নিজের চেষ্টায়।
আতীয় : বাড়িতে বড় কুটুম এসেছে।

২০. বুক

- বক্ষ** : বাবার বুকে হঠাতে ব্যথা উঠেছে।
সাহস : তোমার দেখছি খুব বুকের পাটা!
গর্ব : তোমার কৃতিত্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে।
শান্তি : এসির বাতাসে বুকটা জুড়িয়ে গেল।
হতাশ : রিতা ফেল করেছে শুনে তার বাবার বুকটা যেন ভেঙে গেল।
ভীষণ কষ্ট : বক্ষুর মৃত্যুর খবরে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল।

২১. ভালো

- কুশল** : ভালো আছ তো?
মঙ্গল : ইঞ্চির সবার ভালো করুন।
সৎ : চৌধুরী সাহেব খুব ভালো লোক।
সুন্দর : মেয়েটির চেহারা এত ভালো যে কী বলব!
হিতবাক্য : ভালো কথা শুনলে তোমারই মঙ্গল।
সুখবর : তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে।

২২. মন্দ

- খারাপ** : মন্দ লোকের সাথে মিশতে নেই।
অসৎ : মন্দ কাজের পরিণাম ভালো হয় না।
অশুভ : লোকটি মন্দভাগ্য নিয়েই জন্মেছে।
ধীরে ধীরে : জাহাজটি মন্দ মন্দ এগুচ্ছে।
দাম করা : শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ শেয়ারের দামই এখন মন্দ।

২৩. মাথা

- মস্তক** : তার মাথায় অনেক চুল।
প্রধান : তিনি এ গায়ের মাথা।
প্রণাম : ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা।’
সংযোগস্থলে : রাস্তার চৌমাথায় আমাদের বাড়ি।
পরিশ্রমে : শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে।
বুঝতে পারা : অঙ্কটি আমার মাথায় ঢুকছে না।

২৪. মুখ

- শরীরের অঙ্গ : তোমার মুখটা ভীষণ সুন্দর।
- কথা : ‘মুখে মধু অন্তরে বিষ।’
- সংযত : মুখ সামলে কথা বলো।
- ক্ষমতা : ‘যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।’
- প্রবেশপথ : গলির মুখেই আমাদের বাড়ি।
- সাহস : মুখ ফুটে কথাটা বলে ফেল।

২৫. মাটি

- ধূলা / কাদা : ছেলেটি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে।
- শান্ত / সরল : রাফিক সাহেব একজন মাটির মানুষ।
- বোকামি : শেয়ারের ব্যবসায় নেমে একেবারে মাটি খেয়েছি।
- কবর : তাকে কোথায় মাটি দেওয়া হবে আমি জানি না।
- নষ্ট : পড়াশুনা না করে জীবনটা মাটি করো না।
- নাছোড়বাল্দা : সরকারি কাজ পেতে হলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়।

২৬. রাখা

- স্থাপন : বহিগুলো জায়গামতো রাখো।
- গচ্ছিত : টাকাগুলো ব্যাটকে রেখে এসো।
- আশ্রয় : আমাকে তোমার পায়ে রাখো প্রভু।
- নামকরণ : ‘নাম রেখেছি বনলতা।’
- সম্মান : ছেলেটি বাবার নাম রেখেছে।
- ফেলে আসা : টাকার থলিটি রেখে এসেছি।

২৭. লাগা

- সর্প : তোমার শরীরে কি আমার হাত লেগেছে।
- থামা : নৌকাটি ঘাটে লেগেছে।
- নিযুক্ত : সুমন চাকরিতে লেগেছে।
- শুরু : সূর্যগ্রহণ লাগার সময় হয়ে এসেছে।
- শত্রুতা : কারও পিছনে লাগা ঠিক না।

২৮. শাল

- রং : শাল জামাতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে।
- জেলখানা : মস্তানি করলে শালদালানে পাঠিয়ে দেব।
- বন্ধ হওয়া : অসৎ বন্ধুর পাঞ্চায় পড়ে তার ব্যবসায় শাশবাতি জ্বলেছে।
- ক্রোধ : আমাকে লালচোখ দেখিও না, আমি তয় পাই না।
- পুত্র : “আম্মা শাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।”

২৯. লোক

- মানুষ : রহিম সাহেব ভালো লোক।
- জনসাধারণ : খারাপ কাজ করলে লোকনিদা শুনতে হয়।
- মৃত্যু : জসিম সাহেব গতকাল পরলোকগমন করেছেন।
- মঙ্গুর : লোক দিয়ে কাজ করালে নজর রাখতে হয়।
- গম্ভ : শিশুরা লোক-কাহিনি শুনতে ভালোবাসে।

৩০. সারা

- সমগ্র / সব : সারা গ্রাম জুড়ে হৈচৈ পড়ে গেছে।
- আকুল : শিশুটি মাকে খুঁজে না পেয়ে কেঁদে সারা হলো।
- মেরামত : নৌকার ফুটো সারা হয়েছে।
- সমাপ্ত : ঘাক, এতক্ষণে কাজটি সারা হয়েছে।
- হয়রান / ক্লান্ত : রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে সারা হয়েছি।

১০.২ সমার্থক শব্দের প্রয়োগে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষার শব্দভাড়ারে এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলো একই অর্থ বহন করে। এ রকম সম-অর্থজ্ঞাপক ভিন্ন শব্দকে সমার্থকশব্দ, সমার্থশব্দ, বিকল্পশব্দ বা প্রতিশব্দ বলে।

একই অর্থবহু শব্দের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে। আকৃতি, ব্যঞ্জনা ও গান্ধীর্থের দিক থেকে এসব শব্দের পার্থক্য থাকে। সমার্থকশব্দ জানা থাকলে লেখার বা বলার সময় একই শব্দ বার-বার ব্যবহার করতে হয় না। ফলে বক্ত্বার বা লেখকের মনের ভাব অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়।

নিচে সমার্থকশব্দ বা প্রতিশব্দের কতিপয় দৃষ্টান্ত বাক্যে প্রয়োগ করে দেখানো হলো :

১. অগ্নি : ঘরে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনজন মারা গেছে।

অনল : ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।’

আগুন : ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।’

বহু : ‘জাগো নারী জাগো বক্ষিশিখ।’

বৈশ্বানর : দেখতে দেখতে নিমতলি বস্তিটি বৈশ্বানরের উদরে চলে গেল।

২. অশ্ব : অশ্বখুরে ধুলা উড়িয়ে অশ্বারোহী ছুটে চলে গেল।

ঘোটক : জগা ধোপার ঘোটক তার মতোই দুর্বল আর হাড় জিরজিরে।

ঘোড়া : ‘ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ ইঁটিয়া চলিল।’

তুরঙ্গ : দুরাত্ম গতিতে তুরঙ্গ ছুটে চলেছে।

বাজি : নবাবের আদেশে বাজিপাল বাজি নিয়ে হাজির হলো।

৩. অনুমতি : আমার ঘরে ঢুকতে তোমাকে অনুমতি নিতে হবে না।

আজ্ঞা : আসতে আজ্ঞা হোক।

আদেশ : ‘আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।’

নির্দেশ : স্কুলের বেতন পরিশোধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন।

হুকুম : ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ আসামিকে কাঠগড়ায় উঠাল।

৪. আকাশ : আকাশে আজ মেঘ নেই।

আসমান : ‘নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।’

গগন : ‘গগনে গরজে মেঘ ঘন বরঘা।’

দ্যুলোক : ‘ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির-
বিশ্ব আমি বিশ্ববিধাতৃর।’

নভ : ‘হেথা শ্যামল দুর্বাদল, নবনীল নভস্তল।’

৫. আকাঙ্ক্ষা : মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

ইচ্ছা : ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

কামনা : বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করি।

বাঞ্ছা : ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।

সাধ : ‘আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল সকলই ফুরায়ে যায় মা।’

৬. উন্নত : ‘উন্নত নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।’

উপাদেয় : বহুদিন এমন উপাদেয় খাবার খাই নি।

বরেণ্য : শামসুর রাহমান একজন দেশবরেণ্য কবি।

ভালো : বকুল খুব ভালো ছেলে।

শ্রেষ্ঠ : রবিন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি তা বলা কঠিন।

৭. কুল : বরুশের তিন কুলে কেউ নেই।
 গোত্র : তোমার গোত্র পরিচয় দাও।
 জাত : ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।’
 জাতি : ‘জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।’
 বর্ণ : মানুষে মানুষে বর্ণভেদ থাকা তালো না।
৮. আলয় : শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে হয়।
 গৃহ : ‘গৃহইনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।’
 ঘর : ‘আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর।’
 ধার্ম : এ ধরাধাম ছেড়ে একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে।
 বাড়ি : ‘আমার বাড়ি যাইও ভ্রম বসতে দেব পিড়ু।’
৯. চম্পু : আজ চম্পুগ্রহণ হবে।
 চাঁদ : ‘পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো ঝুটি।’
 শশাঙ্ক : শশাঙ্কে কলঙ্করেখা কে দিয়েছে এঁকে?
 শশধর : শশধরের পূর্ণ আলোয় পৃথিবী ঝলমল করছে।
 শশী : ‘একজ্ঞা শশী জাগিলে আকাশে বাতায়ন খুলে দিয়ো।’
১০. জল : ‘জল পড়ে পাতা নড়ে।’
 পয়ঃ : এ শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়।
 পানি : বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন।
 বারি : বর্ষার বারিধারায় পৃথিবী সজীব হয়ে উঠেছে।
 সলিল : ঝড়ে লঞ্চ ঢুবে যাওয়ায় অনেক লোকের সলিল-সমাধি হলো।
১১. অর্থ : জগতে অর্থই সকল অনর্থের মূল।
 কড়ি : পার ঘাটেতে এসে দেখি পারের কড়ি নাই।
 টাকা : টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে।
 দৌলত : ‘দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কর।’
 ধন : ‘ধনের মানুষ বড় নয়, মনের মানুষ বড়।’
১২. গাঞ্জ : মরা গাঞ্জে বান এসেছে।
 তটিনী : তটিনীর তরঙ্গে ভাসালাম এবার তেলা।
 তরঙ্গিণী : ঘর বেঁধেছি শেরি নামক তরঙ্গিণীর তীরে।
 নদী : ‘আমাদের ছেট নদী চলে বাঁকে বাঁকে।’
 প্রবাহিণী : প্রবাহিণী ছুটে চলে সাগরের পানে।

১৩. জন : জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস।

নর : নর-বানরের যুদ্ধে রাবণ নিহত হয়।

মানব : বিজ্ঞানীরা মানব জাতির কল্যাণে নিরলস গবেষণা করে চলেছেন।

মানুষ : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

লোক : ‘লোকে বলে বলেরে ঘর-বাড়ি ভালা না আমার।’

১৪. পর্বত : ‘পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা।’

গিরি : ‘দুর্গম-গিরি কাঞ্চার মরু দুষ্টর পারাবার।’

পাহাড় : ‘আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।’

ভূখর : ‘আছ অনঙ্গ-অনিলে, চির-নতোনীলে ভূখর সলিলে গহনে।’

শৈল : শৈলশৃঙ্গ তুষারে ঢাকা পড়েছে।

১৫. পাথি : ‘পাখিসব করে রব, রাতি পোহাইল।’

খগ : ‘ময়ূর-ময়ূরী সারী-শুক আদি খগ।’

খেচর : খেচর চলেছে উড়ে নৈর্বাত কোণে।

পঙ্খি : ‘উইড়া যায়রে হংসপঙ্খি, পইড়া রয়রে ছায়া।’

বিহঙ্গা : ‘যাবার সময় হলো বিহঙ্গোর।’

১৬. পৃথিবী : পৃথিবীর প্রায় পঁচিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

জগৎ : এই জগতে আমার আপন বলতে কেউ নেই।

ধরা : ‘শরতে ধরাতল শিশিরে বালমল।’

বসুন্ধরা : ‘ধন-ধান্যে পুক্ষে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।’

বিশ্ব : ‘বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র।’

ভুবন : ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।’

১৭. ফুল : সবাই ফুল পছন্দ করে।

কুসুম : ‘কাননে কুসুম-কলি সকলই ফুটিল।’

পুষ্প : ‘পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।’

প্রসূন : মরি মরি! এ কী প্রসূন শোভায় সেজেছে আমার গৃহ!

১৮ : বন : বনেয়েরা বনে সুন্দর।

অটবি : ‘অটবি বায়ুবশে উঠিত সে উচ্ছসি।’

অরণ্য : ‘দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর।’

জঙ্গল : জঙ্গলে বাঘ থাকে।

বনানী : ‘স্তৰ্থ শরৎ দুপুরে ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে।’

১৯. বাতাস : ঘাড়ে বাতাস সব লঙ্ঘিল করে দিল।

পৰন : পৰনবেগে সে গাড়ি চালিয়ে দিল।

বায় : ‘দখিনা বায় মাগিছে বিদায় শাল বীথিকার কাছে।’

বায়ু : ডাঙ্কার তাকে বায়ু পরিবর্তন করতে বলেছেন।

সমীর : ‘গজার তীর স্লিপ্স সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।’

২০. বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন অক্ষণনীয়।

ক্ষণপ্রভা : ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভায় তাকে এক ঝলক দেখলাম।

তড়িৎ : লোকটি তড়িতাহত হয়ে মারা গেল।

বিজলি : বিজলিবাতিতে পুরো শহরটা যেন চমকাচ্ছে।

বিজুরি : ‘বিজুরি ঝলসে যেন মনে।’

২১. রাত : দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছি, সুখের নাগাল পাই না।

নিশি : নিশি ভোর হয়েছে, এবার আঁখি খোল।

নিশীথ : ‘নিশীথে যাইও ফুল বনে।’

নিশীথিনী : ‘মধুর হলো বিধূর হলো মাধবী নিশীথিনী।’

যামিনী : ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না।’

২২. রাজা : এক দেশে ছিল এক রাজা।

অধিপতি : বাবর ছিলেন ভারতের প্রথম মুঘল অধিপতি।

নৃপতি : আলেকজান্দারের মতো বীর নৃপতি বিশ্বে বিরল।

ভূপতি : ভূপতিকে দেখে মন্ত্রিবর্গ উঠে দাঁড়ালেন।

সম্রাট : সম্রাট অশোক ছিলেন জগদিখ্যাত বীর।

২৩. সাগর : এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

জলধি : উচ্চাল জলধি বক্ষে কার ক্ষুদ্র তরীখানি নির্বিঘ্নে চলেছে পারে?

পাথার : অকূল পাথারে আমি ভাসিয়েছি আমার তরী।

সমুদ্র : সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আছে এক বৃপক্ষার দেশ।

সিন্ধু : ‘গঙ্গা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে।’

২৪. সুন্দর : আমাদের দেশটি খুব সুন্দর।

মনোরম : মনোরম ধরণীর তুলনা হয় না।

মনোহর : তার মনোহর চেহারা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।

রমণীয় : বাহ! কী রমণীয় স্থান!

শোভন : তার পোশাক-আশাক চাল-চলন বেশ শোভন।

২৫. সোনা : সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু।

কনক : ‘কনককষিত কাণ্ঠি কমনীয় কায়।’

কাঞ্চন : প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কাঞ্চন মুদ্রার প্রচলন ছিল।

সৰ্প : সর্পের দাম আকাশচূম্বী।

হিরণ : ‘হিরণ জরির ওড়না গায়।’

২৬. সূর্য : ‘পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে রাত্তগাল।’

অরুণ : অরুণ কিরণ দেয় মধ্যগগনে।

দিবাকর : মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে দিবাকর।

ভানু : ভানুর কৃপায় শীতের প্রকোপ থেকে উলঙ্ঘা ছেলেটি রক্ষা পেল।

রবি : ‘রবির কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।’

২৭. সর্প : ‘সর্প হয়ে দৎশন করো, ওঝা হয়ে ঝোড়ো।’

আহি : আহি-নকুলের যুদ্ধ লেগেছে।

আশীবিষ : ‘কি যাতনা বিষে বুঁধিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দৎশনি যারে।’

নাগ : ‘সর্বাঙ্গে দর্থশিল মোরে নাগ নাগবালা।’

ফণী : প্রবাদ আছে— ফণীর মাথায় মণি থাকে।

সাপ : বাপরে বাপ! কন্তো বড় সাপ!

২৮. মাথা : তার মাথায় অনেক চুল।

মস্তক : মস্তিষ্ক আছে বলেই মস্তকের দাম।

মুঞ্চু : কথায় কথায় সে কেন তোমার মুঞ্চুপাত করে?

মুড়ো : বাবা মাছের মুড়োটি ছেলের পাতে তুলে দিলেন।

শির : ‘শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।’

২৯. চোখ : তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর।

আঁধি : ‘তোমার আঁধির মতো আকাশের দুটি তারা।’

চক্ষু : চক্ষু থাকতে অন্ধের মতো চলো কেন?

নয়ন : ‘নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল।’

নেত্র : তার নেত্র থেকে টপটপ করে অশু পড়তে লাগল।

৩০. কান : কান টানলে মাথা আসে।

কর্ণ : তার কথায় কর্ণপাত করো না।

শুতি : তোমার কথা বাবার কর্ণগোচর হয়নি।

শুতিপথ : চিঁকার করে বলো নয়তো তার শুতিপথে ঢুকবে না।

১০.৩ বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষায় এমন কথকগুলো শব্দ আছে যেগুলো পরস্পরের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। পরস্পরের সম্মুখ বিপরীত অর্থ প্রকাশক এসব শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং ভাব-প্রকাশের ব্যাপকতার জন্য এ জাতীয় শব্দ জানা জরুরি। নিচে কয়েকটি বিপরীতার্থক শব্দের নমুনা বাক্য সহযোগে তুলে ধরা হলো।

অধম - উত্তম : তুমি অধম বলেই আমাকে উত্তম হতে হবে।

আয় - ব্যয় : আয় বুঝে ব্যয় কর।

উপকার - অপকার : কারও উপকার করতে না পারো, অপকার করো না।

উর্ধ্ব - নিম্ন : “উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উত্তলা ধরণীতল।”

কুৎসিত - সুদুর : তোমরা তার বাইরের সুদুর চেহারাটি দেখেছ, তেরের কুৎসিত মনটি দেখ নি।

ধ্যাতি - অধ্যাতি : সেলিমের ধ্যাতির সাথে সাথে কিছু অধ্যাতিও আছে।

গদ্য - পদ্য : আমি গদ্য লিখি, পদ্য লিখতে পারি না।

ঘটন - অঘটন : লেখকরা অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা নিয়ে জন্মান।

চলা - ধামা : চলতে চলতে ধামলে কেন?

জন্ম - মৃত্যু : জন্ম যখন নিয়েছি মৃত্যু তো অবধারিত।

টক - মিঞ্চি : বেণু টক খেতে পছন্দ করে, মিঞ্চি মোটেই খায় না।

ঠাঙ্কা - গরম : গরমে গলা শুকিয়ে গেছে, একটু ঠাঙ্কা পানি খাওয়াবে?

ডান - বাম : রাস্তায় চলার সময় বামদিক দিয়ে চলবে, ডানদিক দিয়ে নয়।

ঢাকা - খোলা : খাবার ঢাকা দিয়ে না রেখে খোলা রেখেছ কেন?

তরল - কঠিন : তরল পানি জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়।

দিন - রাত : ‘রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।’

ধৰ্মস - সৃষ্টি : “আমি সৃষ্টি, আমি ধৰ্মস, আমি লোকালয়, আমি শুশান, আমি অবসান, নিশাবসান।”

নিরীহ - দুর্দান্ত : তাকে দেখে যতটা নিরীহ ভাবছ, ও ততটাই দুর্দান্ত।

পটু - অপটু : প্রকাশ কাজে যত অপটু, খাওয়ায় ততখানিই পটু।

প্রকাশ - গোপন : সত্য কখনো গোপন থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।

ফর্সা - কালো : ফর্স-কালোয় কিছু যায়-আসে না, আমি একজন সৎ ও বিশ্বাসী বল্দু চাই।

বড় - ছোট : ‘বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।’

ভেজা - শুকনো : তোমার ভেজা মাথাটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে নাও।

যত - তত : ‘যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।’

শূন্য - পূর্ণ : “শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।”

১০.৪ বাগধারা

ভাষায় এমন কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ থাকে, যা সাধারণ অর্থের বাইরে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এই সব শব্দ বা বাক্যাংশকে বাগধারা বা বাঞ্ছিদি বলে।

বাগধারা ভাষায় বিশিষ্ট সম্পদ। বাগধারার মাধ্যমে বক্তার মনের গভীর ভাবকে অল্প কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। এগুলো ভাষাকে শক্তিশালী, ব্যঙ্গনাময় ও তাংপর্যপূর্ণ করে তোলে। তাই সব ভাষাতেই বাগধারার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

নিচে বাগধারার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

অ আ ক খ : (প্রাথমিক জ্ঞান) : তোমার তো দেখছি অ আ ক খ জ্ঞান নেই, চাকরিটা পেলে কীভাবে?

অকালকুম্ভাঙ্গ : (অপদার্থ) : অকালকুম্ভাঙ্গ ছেলেকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

আমড়াগাছি করা : (তোষামুদ্দে) : আজকাল আমড়াগাছি না করলে কোনো কাজ হাসিল হয় না।

ইন্দুর কপালে : (মন্দভাগ্য) : এত বড় চাকরি পেয়েও ধরে রাখতে পারলে না, তোমার মতো ইন্দুর কপালে আর কে আছে!

উজানের কই : (সহজলভ্য) : মোবাইল ফোন এখন উজানের কইয়ের মতো, যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

কাপুড়ে বাবু : (বাহ্যিক সভ্য) : আজকাল সত্যিকার অর্থে ভদ্রলোক নেই, সবাই কাপুড়ে বাবু।

খিচুড়ি পাকানো : (জটিল করা) : যা বলবে সহজ করে বল, অথবা খিচুড়ি পাকিয়ো না।

গরজ বড় বালাই : (প্রয়োজনে গুরুত্ব) : পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর, তাই বই কিনতে হবে, গরজ বড় বালাই।

ঘর থাকতে বাবুই ভেজা : (সুযোগ থাকতে কষ্ট) : বাবার অগাধ টাকা, অথচ তুমি কিনা টিউশনি করে চলো, ঘর থাকতে বাবুই ভেজা কেন?

চোখে সাঁতার পানি : (অতিরিক্ত মায়াকান্না) : ব্যাঙের শোকে সাপের চোখে দেখি সাঁতার পানি।

ছেঁড়া চুলে খৌপা বাঁধা : (বৃথা চেষ্টা) : বাবার সামান্য আয়ে সহসারই চলে না, সেখানে আমার প্রাইভেট পড়ার
শখ ছেঁড়া চুলে খৌপা বাঁধার মতোই হাস্যকর।

ঝাকের কৈ : (দলভূক্ত) : রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু স্বার্থের বেলায় সব একই ঝাকের কই।

টাকার গরম : (অর্থের অহংকার) : টাকার গরমে মোহনের পা মাটিতে পড়ে না।

তামার বিষ : (অর্থের কু-প্রভাব) : মেধাবী ছেলেকে তামার বিষে ধরায় সে এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে।

তুলসী বনের বাঘ : (ভঙ্গ) : রনি দিনে যে বাড়িতে কাজ করে, রাতে সেই বাড়িতেই চুরি করতে যায়; ও
হচ্ছে তুলসী বনের বাঘ।

দুধে-ভাতে থাকা : (সুখে থাকা) : ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।’

নাড়ির টান : (গভীর মমত্ববোধ) : বিদেশে গিয়েও অনেকে দেশের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করেন।

পালের গোদা : (দলপতি) : পালের গোদা ধরা পড়েছে, এবার বাকিরাও ধরা পড়বে।

পেটে পেটে বুন্ধি : (দুর্ঘটবুন্ধি) : মেয়েটির পেটে পেটে এত বুন্ধি জানতাম না তো!

ব্যাঙের আধুলি : (সামান্য অর্থ) : ব্যাঙের আধুলি সম্মত করে ব্যবসা করা যায় না।

ভিটায় ঘুঘু চরানো : (সর্বস্বান্ত) : তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

মাছের মায়ের পুত্রশোক : (মিথ্যা শোক) : গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই।

শিবরাত্রির সলতে : (একমাত্র সন্তান) : অর্জুন তার বাবা-মায়ের শিবরাত্রির সলতে, তাই সবাই তাকে সব
সময় চোখে চোখে রাখে।

সোনার পাথর বাটি : (অসম্ভব বস্তু) : সাপের পা দেখা আর সোনার পাথর বাটিতে সুঃপ খাওয়া – দুটোই
আমার কাছে আঘাতে গল্লের মতো।

হ-য-ব-র-ল : (বিশৃঙ্খল) : বাবার মৃত্যুতে গোছানো সহসারটা কেমন যেন হ-য-ব-র-ল হয়ে গেল।

১০.৫ কর্ম-অনুশীলন

১. বাজারে আগুন লেগেছে। ঝড়ো বাতাস বইছে। পানি দিতে হবে। দমকল-বাহিনীর লোকজন এসেছে। আগুন লক্ষণিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। উজ্জ্বল আগুনে অদ্ভুতভাবে সবকিছু পুড়ছে।
-উপরের অনুচ্ছেদটুকু ভালো করে পড়। অনুচ্ছেদে যেসব শব্দের সমার্থক শব্দ তোমার জানা আছে সেগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ এবং দুটি করে বাক্য বানাও।
 ২. মানুষ-এর মাথা থেকেই সব নির্দেশ আসে। চোখ দেখে, কান শোনে আর ঠোট নতুন নতুন কথা বলে। সব ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দুঃখ ও আনন্দ-এর বার্তা আসে মাথা থেকে।
-অনুচ্ছেদটিতে মোটাদাগের যেসব শব্দ আছে, সেগুলোর প্রতিশব্দ লিখে মনের মতো বাক্য তৈরি কর।
 ৩. মেঘমুক্ত রাতের আকাশ। শীতল বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। নির্মল পরিত্র এ রাত শুধুই মিলনের। প্রসন্ন চিন্ত তাই যেন উন্মুখ হয়ে কবিতার মিল খুঁজে ফেরে।
-উপরের অনুচ্ছেদের মোটা দাগের শব্দগুলোর অর্থসহ বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।
 ৪. তুমি নিজে এ রকম একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর এবং সেখান থেকে একটি বা দুটি শব্দ বেছে নিয়ে সেটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য তৈরি কর।
-

নির্মিতি

- ১. অনুধাবন শক্তি**
- ১.১ অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা**
- ২. সারাংশ ও সারমর্ম**
- ৩. ভাবসম্প্রসারণ**
- ৪. পত্র রচনা : ব্যক্তিগত পত্র, আবেদন পত্র, নিম্নণ পত্র**
- ৫. প্রক্রিয়া রচনা**

১. অনুধাবন শক্তি

লিখিত কোনো বিষয় পাঠ করে তার মূলভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারার ক্ষমতাই অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে এবং বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখ্যস্থ করলে সেটি বেশিদিন মনে নাও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

১.১ অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা :

সন্দেন, প্রতীতি, প্রান্ত, হিমেল, বর্ণ, প্রাপ্তি শীতের ছুটিতে জগৎপটিতে বেড়াতে গিয়েছে। ওরা সবাই এলাকাটি ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করে। বেশ কিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছে। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগান রয়েছে। জগৎপটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

কর্ম-অনুশীলন :

- ক. ‘প্রতীতি’ শব্দের অর্থ কী?
- খ. কৃষিজীবী কারা?
- গ. নানা পেশার মানুষ বলতে কী বুঝায়?
- ঘ. জীবিকা বলতে কী বুঝা?
- ঙ. আদর্শ গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. সারাংশ ও সারমর্ম

সারাংশ

- ২.১** কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসে নি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। সে-ভাষায় এ-দেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেক দিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে-ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

সারাংশ : ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। হাজার বছরের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এমনি ভাবেই আমাদের বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

- ২.২** আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-সৰ্প-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায় – নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঞ্চলিক শিল্পকলা।

সারাংশ : মানুষের জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে আনন্দে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দকে সে উপলব্ধি করে। সেই আনন্দানুভূতি সবার কাছে জানাতে চায়। তাই ছবি, গান, কবিতা, নাচ, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষ তার আনন্দকে প্রকাশ করে। এই আনন্দ ও সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

- ২.৩** বাঙালি যেদিন ঐক্যবন্ধ হয়ে বলতে পারবে – ‘বাঙালির বাংলা’ সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়তা, মৃত্যুত্তয়, আলস্য, তদ্বা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তমস, এই তিমির, এই জড়তাই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অম্বকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিষেচে, মৃতপ্রায় করে রাখে।

সারাংশ : বাঙালি প্রেম-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিতে পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু আলস্য তাদের দুর্বল করে রেখেছে। অলসতা আর কাজের প্রতি অনীহার জন্য তারা জগতের সবকিছু থেকে পিছিয়ে আছে। এই আলস্য ও কর্ম বিমুখতাকে উপেক্ষা করে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। তবেই এই বাংলা প্রকৃত অর্থে বাঙালির হবে।

২.৪ একজন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে তদ্ব কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ঢাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

সারাংশ : সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব-কায়দার মধ্যে দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সুন্দর স্বত্বাবের মধ্যেই মানুষের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

২.৫ সুর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিক্ষার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিক্ষার আলো পেয়ে আমাদের ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিক্ষার ফলে আমাদের ভেতর যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ : সুর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিক্ষার আলো মনের অন্ধকার দূর করে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে শক্তি লুকানো আছে। শিক্ষা এ শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষার ফলে আমরা জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করে নিজের শক্তিকে কাজে লাগাই। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি।

২.৬ নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বজ্জ্বলি!
 গঞ্জার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
 অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
 ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
 পল্লবঘন আম্বকানন রাখালের খেলাগেহে,
 সতর্ক অতল দিঘি কালোজল— নিশীথশীতল স্নেহ।
 বুকভরা মধু বজ্জের বধু জল লয়ে যায় ঘরে—
 মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

সারমর্ম : মা ও মাতৃভূমি সবার কাছে প্রিয়। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি—এর আকাশ-বাতাস, নদী, মাঠ, প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ সবই আমাদের ভালোবাসার ধন। বাংলার আবহমান অপরূপ রূপে প্রতিটি বাঙালিই মোহ-মুগ্ধ।

২.৭ ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
 বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
 দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
 মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
 অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি,
 গৃহের প্রতি টান—
 তৈল-চালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা রসে ভরা
 মাথায় ছেটো বহরে বড় বাঙালি সন্তান।
 ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন。
 চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
 ছুটছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
 জীবনস্মোত আকাশে ঢালি
 হৃদয়—তলে বহি জ্বালি চলেছি নিশিদিন—
 বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
 সদাই নিরুদ্দেশ
 মরুর বড় যেমন বহে সকল বাধা-হীন।

সারমর্ম : বাঙালি শান্তশিষ্ট, কর্মহীন, আরামপ্রিয় ও অলস জাতি। এ জীবন কারও কাম্য হতে পারে না। তার চেয়ে সাহসী, কর্মী ও চথঙ্গলতা মুখর জীবনের অধিকারী হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

৮.৮ এই যে বিটপি-শ্রেণি হেরি সারি সারি—
 কি আচর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
 কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
 ফল-ভরে নত কেহ গুণীর মতন।
 এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
 ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্বালচক্ষে চেয়ে।

যখন মানবকুল ধনবান হয়,
 তখন তাদের শির সমুদ্রত রয়।
 কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
 অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
 ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুদ্রত,
 নীচ প্রায় কার ঠাই নহে অবনত।

সারমর্ম : গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। তাতে তার গৌরব থাকলেও অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষের অর্থ হলেই অহংকার, অর্থ ফুরিয়ে গেলেই মাথা নিচু হয়। গাছ ফলশূন্য হলেও কিন্তু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ স্বভাবের মানুষের মতো সে কারও কাছে অবনত হয় না।

২.১

সাম্যের গান গাই-

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো তেদাভেদ নাই।
 বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
 অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
 বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশুবারি
 অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
 জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
 মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
 কোন রণে কত খুন দিল নর, সেখা আছে ইতিহাসে,
 কত নারী দিল সিথির সিংদুর, সেখা নাই তার পাশে।
 কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
 বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
 কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
 প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয়েছে, নারীর ততটা হয় নি। নারীকে তার কর্ম-স্মৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দিন এসেছে সম-অধিকারের। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

২.১০ হে সূর্য! শীতের সূর্য!

হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়

আমরা থাকি

যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চথগল ঢোখ

ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,

আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!

সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে

এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,

কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক টুকরো রোদুর—

এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

সারমর্ম : সূর্যের শক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠে গাছপালা, জীব-জন্ম ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচন্ড শীতে সূর্যের একটু উভাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। সমাজের অবহেলিত ও সুবিধা-বন্ধিত এসব মানুষের কাছে সূর্যের উষ্ণতা সোনার চেয়েও দামি।

৩. ভাব সম্প্রসারণ

৩.১ এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ভাব সম্প্রসারণ : মানুষ স্বভাবতই যত পায়, তত চায়। তার চাওয়ার শেষ নেই। এ জগতে যার যত বেশি আছে, সে তত আরও বেশি চায়। যে লাখ টাকার মালিক, সে কোটিপতি হতে চায়। যার কোটি টাকা আছে, সে হাজার কোটি টাকা পেতে চায়। রাজার বিপুল সম্পদ আছে। তবুও তার রাজ্য জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কেননা তার আরও সম্পদ চাই। আরও তোগ, আরও বিলাসিতা প্রয়োজন তার। এই আরও পাওয়ার ইচ্ছা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। নিজের মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা গরিবের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তারা তাদের তোগ-লালসা মেটাতে গরিবের সামান্য সম্পদ আসাসৎ করে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ধনীদের এই লোভে সমাজের দীনহীন গরিব মানুষগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রতারিত; সহায়-সম্মতহীন পথের ফরিদ। এতে ধনীদের মনে সামান্যতম করুণাও হয় না।

৩.২ করিতে পারি না কাজ

সদা ভয়, সদা শাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে শোকে কিছু বলে।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : মানুষেৰ জীৱন কৰ্মযুথৰ। কাজেৰ মাধ্যমেই মানবজীৱনেৰ সফলতা আসে। কাজ কৰতে গেলে ভুল হয় এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে মানুষ তাৰ জীৱনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে সবাই কৰ্মী নয়। কিছু অলস-অকৰ্মণ্য মানুষ আছে, যারা সব সময় অন্যেৰ পেছনে লেগে থাকে। তাদেৱ কাজেৰ খুঁত ধৰে, অন্যায় সমালোচনা কৰে। ফলে অনেক সময় কোনো কাজ কৰতে গেলে কেউ কেউ দ্বিধাত্বস্ত হয়। কে কী মনে কৰবে, কে কী সমালোচনা কৰবে এই সব ভেবে তাৰা বসে থাকে। যার জন্য কাজ এগোয় না। তাই যারা সমাজে অবদান রাখতে চায় তাদেৱ দ্বিধা কৰলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে শোকলজ্জা ও সমালোচককে উপোক্ষা কৰতে হবে। মানুষেৰ কল্যাণে মহৎ কাজ কৰতে হলে ভয়ত্বীতি সংকোচকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৩.৩ বিশ্বেৰ যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিৱ-কল্যাণকৰ

অৰ্ধেক তাৰ কৱিয়াছে নারী, অৰ্ধেক তাৰ নৱ।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : মানব-সভ্যতা বিকাশে নারী ও পুৱুষেৰ সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুৱুষেৰ সম্বলিত প্ৰচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে আমাদেৱ সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সৃষ্টিকৰ্তা নারী ও পুৱুষকে সৃষ্টি কৱেছেন একে অপৱেৱ পৱিপূৰক হিসেবে। তাই নারী ও পুৱুষ চিৱকালেৰ সাৰ্থক সঙ্গী। একই মুদ্রাৰ এপিঠ-ওপিঠ। সৃষ্টিৰ আদিমকাল থেকে নারী পুৱুষকে জুগিয়েছে প্ৰেৱণা, শক্তি ও সাহস। আৱ পুৱুষ বীৱেৰ মতো সব কাজে অৰ্জন কৱেছে সাফল্য। আজ পৰ্যন্ত বিশ্বে যত অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তাৰ অন্তৱালে নারীৰ ভূমিকাই মুখ্য। সংজ্ঞাত কাৱণেই নারী ও পুৱুষেৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰে ভিন্নতা আছে। তবুও নারী যেমন পুৱুষেৰ ওপৱ নিৰ্ভৱশীল, পুৱুষও তেমনি নারীৰ মুখাপেক্ষী। নারীকে বাদ দিয়ে পুৱুষেৰ জীৱন অসম্পূৰ্ণ, অৰ্থহীন। নারী ও পুৱুষেৰ মিলনেৰ মধ্যেই রয়েছে জগতেৰ সমস্ত কল্যাণ। উভয়েৰ দানে পুষ্ট হয়েছে আমাদেৱ পৃথিবী।

৩.৪ আমাৱ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো একুশে ফেতুয়াৱি

আমি কি ভুলিতে পারি।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : পৃথিবীৰ সকল দেশেৱই জাতীয় জীৱনে এমন দু-একটি দিন আসে যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আমাদেৱ জাতীয় জীৱনে এমনি মৃতি-বিজড়িত মহিমা-উজ্জ্বল একটি দিন একুশে ফেতুয়াৱি। সারা বিশ্বেৰ বাংলা ভাষীদেৱ কাছে এ দিনটি চিৱ-অৱণীয়। একুশে ফেতুয়াৱিৰ ইতিহাস একদিকে আনন্দেৱ, অন্যদিকে বেদননাৱ। পাকিস্তানি বৈৱ-শাসকৱা বাঙালিৰ মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল ১৯৪৮ সালে। বাংলাৱ মানুষ

সে অন্যায় মেনে নেয় নি। বাংলার দামাল ছেলেরা তুমুল বিরোধিতা করে রাজপথে নেমে আসে। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ দাবিতে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। বৈরাচারী পাক-সরকার আন্দোলন দমনের জন্য শুরু করে ফ্রেফতার, জুলুম, নির্যাতন। এতেও বাংলার দুরত্ব ছেলেদের দমাতে না পেরে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তাদের মিছিলে নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। রফিক, শফিক, বরকত, জবরার, সালামের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আর সমগ্র বাঙালির চেতনায় চিরমরণীয় ও বরণীয় থাকে ভাষা-শহিদদের নাম। তাঁদের খণ্ড আমরা কোনো দিন ভুলব না।

৩.৫ জনিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা করবে চিরস্থির কবে নীর হয় রে জীবন নদে!

ভাব সম্পদসারণ : মানুষ মরণশীল। মানুষ অমর নয়। একদিন সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ প্রহণ করতে হবে। মৃত্যুই জীবনের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুকে ঠেকানোর ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। মানবজীবন নদীর জলের মতো প্রবহমান। নদীর জোয়ার-ভাটার মতো মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, উঞ্চান-পতন আছে। জাগতিক নিয়মেই জীবন চলে। এটাই প্রকৃতির বিধান। তাই মৃত্যুকে অথথা তয় পাবার কিছু নেই। বরং এই সত্যকে মেনে নিয়ে মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। কর্মগুণে সমাজ-সভ্যতায় নিজের কীর্তির চিহ্ন রেখে যেতে হবে। নিষ্কল্প জীবনের অধিকারী মানুষকে কেউ মনে রাখে না। কিন্তু কৃতী লোকের গৌরব জীবনের সীমা অতিক্রম করে অমরতা ঘোষণা করে। মানুষেরও শরীরের মৃত্যু হয়। কিন্তু তার জীবনের পুণ্যকর্ম পৃথিবীতে চিরমরণীয় হয়ে থাকে। নশ্বর মৃত্যুও মানুষের জীবনে তখন অবিনশ্বর হয়ে ওঠে।

৩.৬ বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

ভাব সম্পদসারণ : বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের ইতিহাস অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ইতিহাস। বাঙালি জাতি কারও অধীনতা কোনো দিন মেনে নেয় নি। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অবস্থান চিরকালই ছিল বজ্রকঠিন। তাই এখানে বারবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে। উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে প্রায় দুশো বছর ধরে নিষ্পেষিত হয়েছে এ জাতি। ১৯৪৭-এ সেই জাঁতাকল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তি পেলেও বাঙালির মুক্তি মেলে নি। এ বন্ধন বাঙালি মেনেও নেয় নি। ১৯৫২ সালের রক্তবরা ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মুক্তি-সংগ্রামের দিকে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক বাংলার দামাল ছেলেদের ওপর গুলি চালায়। গুলি করে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানেও। বারবার বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। তবুও তাদের স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি জান্তা-বাহিনী। তাই তারা ১৯৭১-এ বাঙালির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। তখন বাংলার মানুষ ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তি-সংগ্রামে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকের রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়। অবশেষে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৩.৭ সংজ্ঞা দোষে গোত্র ভাসে।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : প্ৰত্যেক মানুষই তাৰ জীৱন পরিচালনাৰ ক্ষেত্ৰে একটি স্বাধীন সংজ্ঞা বহন কৰে। সে একাই তাৰ বিবেককে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তবে এক্ষেত্ৰে তাৰ সংজ্ঞাৰ প্ৰভাৱ বিশেষভাৱে লক্ষণীয়। ভবিষ্যতেৰ সুন্দৰ বা খাৱাপেৰ বিষয়টি নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিৰ ইচ্ছা বা সংজ্ঞা নিৰ্বাচনেৰ ওপৰ। যেসব মানুষ উন্নত চৱিত্ৰি বা সৎ-স্বভাৱেৰ লোকেৰ সংজ্ঞা মেলামেশা কৰে, তাদেৰ স্বভাৱ-চৱিত্ৰি সুন্দৰ ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা কুসংজ্ঞা বা কুসংসৰ্পণ থেকে নিজেদেৰ চৱিত্ৰেৰ অধঃপতন ঘটিয়েছে, সমাজে তাদেৰ বিপৰ্যয় অনিবার্য। তাই মানবজীৱনে সংজ্ঞা নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৱাত্পূৰ্ণ বিষয়। প্ৰকৃতিতেও যেসব বস্তু সুন্দৰ ও রমণীয়, সেগুলোৰ সংস্পৰ্শে যেসব বস্তু থাকে তাৰাও সুন্দৰ ও আকৰ্ষণীয় হয়ে ওঠে। খাৱাপ বস্তুটি সুন্দৰ বস্তুটিৰ গুণ নিজেৰ মধ্যে ধাৰণ কৰে অন্যেৰ কাছে নিজেকে মৰ্যাদাবান ও গ্ৰহণযোগ্য কৰে তোলে। প্ৰকৃতপক্ষে, সংজ্ঞাই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত কৰে তোলে। আৱ এজন্য সংজ্ঞাই হলো সবকিছুৰ সাফল্য ও বিফলতাৰ চাৰিকাঠি।

৩.৮ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : লোভ মানুষেৰ পৱন শত্ৰু। লোভ মানুষকে অন্ধ কৰে; তাৰ বিবেক বিসৰ্জন দিয়ে তাকে ধৰণ্যসেৰ দিকে ঠেলে দেয়। লোভেৰ বশবৰ্তী হয়েই মানুষ জীৱনেৰ সৰ্বনাশ দেকে আনে। মানুষ নিজেৰ ভোগেৰ জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়াৰ প্ৰবল ইচ্ছা পোৰণ কৰে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজেৰ নয়, যা পাওয়াৰ অধিকাৰ তাৰ নেই, তাৰ পাওয়াৰ জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তাৰ ইচ্ছাকে সাৰ্থক কৰে তুলতে চায়। লোভেৰ মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসৰ্জন দেয়। তাৰ ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপেৰ পথে ধাৰিত হয়। নিজেৰ স্বার্থেৰ জন্য অন্যেৰ সৰ্বনাশ কৰে। এভাৱে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত কৰে। দেকে আনে মৃত্যুৰ মতো ভয়াবহ পৱিণাম। জীৱনকে সুন্দৰ ও সাৰ্থক কৰে তোলাৰ জন্য লোভ বৰ্জন কৰা উচিত।

৩.৯ জ্ঞানহীন মানুষ পশুৰ সমান।

তাৰ সম্প্ৰসাৱণ : সৃষ্টিৰ অন্যান্য প্ৰাণীৰ থেকে মানুষকে আলাদা কৰেছে তাৰ বিবেক বা জ্ঞান, যা অন্য কোনো প্ৰাণীৰ মধ্যে নেই। প্ৰতিটি মানুষেৰ মধ্যেই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলনেৰ মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান কৰে। নানা বিদ্যায় পারদৰ্শী কৰে তোলে। জ্ঞানেৰ আলোকেই মানুষেৰ জীৱন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই মানুষ হিসেবে শ্ৰেষ্ঠত্ব লাভেৰ জন্য জ্ঞানেৰ সহায়তা অপরিহাৰ্য। অন্য প্ৰাণীৰ সংজ্ঞা মানুষেৰ পাৰ্থক্য এখানেই। জ্ঞানবান মানুষ কখনো খাৱাপ কাজ কৰতে পাৱে না। তাৰ বিবেক তাকে খাৱাপ আচৰণ কৰতে বাধা দেয়। অপৱেদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুৰ মতো নিৰ্বোধ। পশুৰ যেমন জ্ঞান নেই। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পাৱে না। অজ্ঞান ব্যক্তিৰও তেমনি কোনো বিবেক নেই। জ্ঞানেৰ অভাৱে তাৰা আধুনিক জীৱনেৰ সম্পূৰ্ণ স্বাদ উপভোগ কৰতে পাৱে না।

তাদের জীবনের সঙ্গে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞানই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। তাই মানুষকে সব সময় জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত থাকা দরকার।

৩.১০ একতাই বল।

ভাব সম্প্রসারণ : মানুষ পারিবারিক জীব। পরিবারের প্রত্যেকে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ; মানুষের একতাবোধ। তাই মানবজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে একতার গভীর সম্পর্ক। মানুষকে সব সময় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। তার শত্রুর শেষ নেই। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মানুষের দরকার সংঘবন্ধ শক্তির। একতাবন্ধ জীবনে আছে নিরাপত্তার নিচয়তা। ঐক্যবন্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পদানত করতে পারে না। একতার কল্যাণ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনেও। একজনে যে কাজ করতে পারে, দশজনে তার বহুগুণ কাজ করা সম্ভব। এভাবে জাতি একতার গুণে বড় হয়। আজকের বিশ্বে যারা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত তারা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যে উদ্বৃদ্ধ হয়েছে। যে জাতি ঐক্যবন্ধ নয়, সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষমুবাল্পবহীন নিঃসঙ্গ জীবন যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনি একতাহীন জাতির ধৃঢ়স অনিবার্য। ব্যক্তিজীবনের স্বার্থে, জাতীয় জীবনের কল্যাণে এবং মানবজাতির মজালের জন্য মানুষের একতাবন্ধ থাকা একান্তই অপরিহার্য।

৪. পত্র রচনা

৪.১ ব্যক্তিগত পত্র :

ক. মনে কর তোমার নাম দুরস্ত। তোমার বস্ত্র নাম রাহুল। সে খুলনায় থাকে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তার কাছে একটি পত্র লেখ।

পল্লবী, ঢাকা
২৩.০১.২০১৮

প্রিয় রাহুল

আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার কোনো খবর পাই না। আশা করি তালো আছ। গতদিন আমাদের স্কুলে ‘বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা’ বিষয়ে একটি সেমিনার হয়ে গেল। সেই সেমিনারেই বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম। তোমাকে সেগুলো জানাতেই এ চিঠি লিখতে বসেছি।

তুমি তো জানো, গাছ আমাদের পরম বস্ত্র। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অঞ্জিজেন গ্রহণ করি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অঞ্জিজেন সরবরাহ করে এবং বিশাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজাড় হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

তুমি হয়তো জানো না, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মূল তু-খণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। বরং যা আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কলকারখানা ও গাড়ির ধোয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। ক্ষয় হচ্ছে বাতাসের ওজন স্তর। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউজ অ্যাফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখো দিচ্ছে নানা রোগ-ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অঞ্জিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অঞ্জিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তা ছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় বৃক্ষের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িয়ার এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দুপাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচব।

আজ এই পর্যন্তই। তোমার মা-বাবাকে আমার শুন্দু জানিও। চিঠি দিও।

ইতি—

তোমার বস্ত্র

দুরস্ত

ডাক টিকিট	
প্রেরক:	প্রাপক:
দুরস্ত	মো. রাহুল
৩৫০ পল্লবী, মিরপুর	সোনারতরী
ঢাকা।	৩৩ স্যার ইকবাল রোড
	খুলনা।

খ. তোমার বন্ধু মোহনার মা হঠাতে মারা গেছেন। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি চিঠি শেখ।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

২৫.০৭.২০১৮

সুপ্রিয় মোহনা,

কিছুক্ষণ আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে আমি স্তুষ্টি। তুমি শিখেছ তোমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর কথা। আমার কাছে এখনো সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এ যেন বিনা মেঘে বঙ্গপাতের মতো! আমি খুবই মর্মাহত। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই। শুধু জেনো, তোমার এ মর্মবেদনার আমিও সমান অংশীদার।

ছেটবেলায় আমি মাকে হারিয়েছিলাম। মায়ের আদর-ভালোবাসা কাকে বলে জানতাম না। তোমার মা আমার সেই অনুভূতি জাগিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমি মা বলে ডেকেছি। আজ আমি আবার মা-হারা হলাম। মানুষ মরণশীল – এই নির্মম সত্যটা আমাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। কাজেই দুঃখ না করে মায়ের আত্মার শান্তির জন্য তিনি যেমনটি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে আমাদের সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। পড়াশোনায় আত্মানিয়োগ কর। বাবা ও ছেট ভাইয়ের প্রতি খেয়াল রেখ। কয়েক দিন পরে তোমার দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা। নিজের পড়ার কাজে ডুবে থাকলে এ বেদনা হয়তো আস্তে আস্তে প্রশংসিত হবে।

পরীক্ষার কারণে আমি তোমার এই দুঃসময়ে কাছে থাকতে পারলাম না, এটাও আমার জন্য খুব কঠিক। কায়মনোবাকে কামনা করি, তুমি এই প্রতিকূলতা যেন কাটিয়ে উঠতে পার। আমার আন্তরিক সমবেদন রইল। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

তোমার বাবাকে সালাম জানিও। ছেট ভাই সিয়ামের প্রতি রইল আমার অসীম স্নেহ।

ইতি-

তোমার বন্ধু

সুমনা।

	ডাক টিকিট
প্রাপক:	
মোহনা	
প্রেরক:	মো. ফিরদাউস
সুমনা	তারাবনিয়াছড়া
৮০ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।	কল্পবাজার।

গ. মনে কর, তোমার ছেট ভাই হাসান ষষ্ঠি শ্রেণিতে পড়ে। তাকে ‘পরীক্ষায় অসদুপায় অবশ্যন্বন ব্যক্তি তথা জাতির জন্য হৃষিকেশরূপ’ এই মর্মে একটি পত্র পাঠাও।

সিদ্ধিরগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ

১৭.০৮.২০১৮

স্নেহের হাসান

আমার আদর নিও। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ও বাড়ির সবাই ভালো আছ জেনে খুশি হয়েছি।

চিঠিতে জানতে পারলাম আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমার পরীক্ষা শুরু হবে। তোমার পড়াশোনা নিশ্চয়ই ভালোভাবে চলছে? মনোযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়ো এবং বারবার লেখো। নিজের ভুলগুলো নিজেই সংশোধন কর। এতে তোমার হাতের লেখা যেমন সুন্দর হবে, তেমনি লেখায় বানান ভুলও কমে যাবে। ফলে পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর পাবে।

আজকাল অনেক শিক্ষার্থীই ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের কথা শোনে না। বাড়িতেও ঠিকমতো পড়ালেখা করে না। তারা পরীক্ষার হলে গিয়ে নকল করে। কেউ কেউ নকল করে ভালোভাবে পাসও করে যায়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাদের হয় না। ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীতে তারাই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। তাই পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাদের নিজেকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পরীক্ষায় নকল করা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি জাতিকে ধৰন্সের দিকে নিয়ে যায়। নকলের মতো দুর্নীতি বা পাপের ওপর ভিত্তি করে জীবনে কখনোই সাফল্য লাভ করা যায় না।

আশা করি, তুমি শিক্ষকদের উপদেশ মতো পড়াশোনার প্রতি গভীর মনস্থযোগ করবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে আমাদের পরিবার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমার কৃতিত্ব ও গৌরব কামনা করি। ভালো থেকো। বাবা ও মাকে আমার সালাম জানিও।

ইতি—
বাধন।

ডাক টিকিট	
প্রেরক:	প্রাপক:
বাধন	প্রযত্নে : বুলবুল আহমেদ
২১২, সিদ্ধিরগঞ্জ	গ্রাম : কুলচিয়া
নারায়ণগঞ্জ।	ডাকঘর : কুলিয়ারচর
	জেলা : সুনামগঞ্জ।

ঘ. কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার হোট বোন বনানীকে একটি চিঠি লেখ।

আহসান রোড

বগুড়া

১৫.০৭.২০১৮

প্রিয় বনানী

আমার স্নেহশিস নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আরও খুশি হয়েছি তুমি ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে কম্পিউটার শিখছ বলে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর প্রযুক্তির এ যুগে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক জীবন-যাপন কঢ়না করা যায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, টিকিঙ্গো, বিনোদন – সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই কর্মক্ষেত্রেও এখন কম্পিউটার জানা লোকদের অগ্রাধিকার। কম্পিউটার-অভিজ্ঞ লোক বেকার বসে থাকে না। তাই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকেরও উচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তুমি ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার ভালোভাবে আয়ত্ত করবে, আমার এই শুভ কামনা রাখি।

আজ আর না। মা ও বাবাকে আমার সালাম দিও। তুমি ভালো থেকো।

ইতি–

তোমার ভাইয়া

রনি

ডাক টিকিট	
প্রেরক:	প্রাপক:
রনি	ব্রতত্বী বনানী
১০৪, আহসান রোড	গ্রাম : বাগুড়াজগ্গা
বগুড়া।	ডাকঘর : মূলশ্রী
জেলা : জামালপুর।	উপজেলা : কালিয়া
	জেলা : নড়াইল

৪.২ আবেদন পত্র :

ক. মনে কর তোমার নাম আবরার জুবায়ের তাজ। অষ্টম শ্রেণিতে তোমার রোল নম্বর ০১। হঠাতে করে তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তোমার লেখাপড়া বন্ধ হতে বসেছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একথানি আবেদন পত্র লেখ।

১৪.০৬.২০১৮

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

এস. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, দাঢ়িয়াপুর।

বিষয় : বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। বিগত তিন বছর যাবৎ আমি এ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছি। পরীক্ষায় সব সময়ই আমি প্রথম হয়ে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছি। অষ্টম শ্রেণিতেও আমার রোল নম্বর ০১। আমার বাবা একজন দারিদ্র কৃষক। পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়াও আমাদের তিন ভাইবোনের লেখাপড়ুর খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। তবুও তিনি এ যাবৎ বিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে আমাদের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

আবরার জুবায়ের তাজ

রোল নং ০৩, অষ্টম শ্রেণি

এস. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, দাঢ়িয়াপুর।

খ. শিক্ষাসফরের গুরুত্ব উল্লেখ করে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন পত্র লেখ ।

২০.১২.২০১৮

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

গজারিয়া শান্তিকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর ।

বিষয় : শিক্ষাসফরে প্রেরণের জন্য আবেদন ।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী । প্রতি বছর এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে গিয়ে থাকে । কিন্তু এ বছর এখনো তার কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয় নি । আমরা শিক্ষাসফরে যেতে চাই । ছাত্রজীবনে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । শিক্ষাসফরের ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয় । যেকোনো ভ্রমণেই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোভাবে জ্ঞানার সুযোগ হয় ।

আমরা এবার শিক্ষাসফরে ময়মনসিংহে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি । ময়মনসিংহ প্রাচীন শহর । এর মুক্তাগাছা থানা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে খুব অগ্রগামী ছিল । সেখানে প্রাচীন জমিদার বাড়ি আছে । ময়মনসিংহ শহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন । সে স্মৃতিচিহ্নও দেখা যাবে । তাছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দমোহন কলেজ, জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ইত্যাদিও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্র রয়েছে । এসব স্থান ও স্থাপনা দর্শন করে আমরা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব ।

একদিনের এই সফরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব । আমাদের সঙ্গে দুজন সিনিয়র শিক্ষক যেতে রাজি হয়েছেন । আপনার সম্মতি পেলে শিক্ষাসফরে যাওয়ার দিন ধার্য করে আমরা আমাদের অভিভাবকদের অনুমতি গ্রহণ করব ।

অতএব, মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন, আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার সদয় অনুমতি দিয়ে এবং ময়মনসিংহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন ।

বিনীত-

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে

সায়মা শতাব্দী

গজারিয়া শান্তিকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর ।

গ. মনে কর, তোমার বাবা একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। সম্প্রতি তোমার বাবার বদলি হয়েছে। তাই তোমাকেও তার সাথে চলে যেতে হবে। এজন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন কর।

১৭.০৯.২০১৮

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। আমার বাবা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সম্প্রতি তাকে কক্ষবাজার জেলা শহরে বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সবার সঙ্গে আমাকেও কক্ষবাজার যেতে হচ্ছে। সেখানে নতুন করে ভর্তির জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

তাহসিন আহমেদ

রোল নং - ১২, ৮ম শ্রেণি

কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

ঘ. ধৱ, তুমি নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় স্থীপুরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে একটি ‘বিজ্ঞান ক্লাব’ গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রথান শিক্ষকের নিকট একখালা আবেদন পত্র রচনা কর।

১২.০৯.২০১৮

বরাবর

প্রথান শিক্ষক

নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, স্থীপুর

বিষয় : ‘বিজ্ঞান ক্লাব’ গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আর বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, তথ্য আদান-পদান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরিতেও দ্রুত সফলতা অর্জন করব।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাদের বিদ্যালয়ে একটি ‘বিজ্ঞান ক্লাব’ গঠনের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক-

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে

আবদুস সালাম

নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, স্থীপুর

৫.৩ নিম্নৰূপ পত্র :

ক. তোমার স্কুলে ‘নজরুল জন্মজয়ন্তী’ উদ্যাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

সুধী

আগামী ১১ই জৈষ্ঠ, ১৪২২/ ২৫শে মে, ২০১৫, শুক্রবার বিকাল চারটায় বিদ্রোহী ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করবেন প্রধান শিক্ষক সরোজ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত-

তারিখ : ১৫.০৫.২০১৫

ইমরান আহমেদ

আহ্বায়ক

নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন পরিষদ
শিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।

অনুষ্ঠানসূচি

- ০৪. ০৫ : অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
- ০৪. ২০ : পরিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
- ০৪. ৩০ : বিশেষ আলোচনা
- ০৫. ০০ : সভাপতির ভাষণ
- ০৫. ৩০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

খ. ধর, তোমার পাড়ায় “আঞ্চলিক মেত্রী সংঘ” নামে একটি ক্লাব আছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে বাস্তা নববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে একটি নিমজ্জন পত্র রচনা কর।

প্রিয় সুধী

শুভ ‘নববর্ষ’ উদ্যাপন উপলক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ, ১৪২২/ ১৪ই এপ্রিল, ২০১৫, শনিবার সকাল ০৭টায় আঞ্চলিক মেত্রী সংঘের পক্ষ থেকে এক বর্ণাচ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধের আমন্ত্রিত।

বিনীত-

তারিখ : ২৫.৩.২০১৫

অরিন্দম খালেক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আঞ্চলিক মেত্রী সংঘ, সিলেট।

অনুষ্ঠানসূচি

০৬.৩০ : মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

০৭.৩০ : সংঘ-প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু; এলাকা পরিভ্রমণ

০৯.০০ : সংঘের মিশনায়তনে প্রীতিভোজ

১০.০০ : মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১২.০০ : সমাপ্তি।

৫. প্রবন্ধ রচনা

৫.১ বাংলাদেশের ষড়খতু

সূচনা : বাংলাদেশ খতু-বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে এক এক খতুর এক এক রূপ। খতুতে খতুতে এখানে চলে সাজ বদলের পালা। নতুন নতুন রঙ-রেখায় প্রকৃতি আলপনা আঁকে মাটির বুকে, আকাশের গায়ে, মানুষের মনে। তাই খতু বদলের সাথে সাথে এখানে জীবনেরও রঙ বদল হয়। সে-কারণেই বুঝি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঢ়ে ধ্বনিত হয়—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—

তুমি বিচিত্র ঝুপিণী।

ষড়খতুর পরিচয় : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে খতুর সংখ্যা চারটি হলেও বাংলাদেশ ছয় খতুর দেশ। এখানে প্রতি দুই মাস অন্তর একটি নতুন খতুর আবির্ভাব ঘটে। খতুগুলো হচ্ছে— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এরা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আর প্রত্যেক খতুর আবির্ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মকাল : খতুচক্রের শুরুতেই আসে গ্রীষ্ম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। আগুনের মশাল হাতে মাঠ-ঘাট পোড়াতে পোড়াতে গ্রীষ্মরাজের আগমন। তখন আকাশ-বাতাস ধূলায় ধূসরিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির শ্যামল-স্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে যায়। খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায়। অসহ্য গরমে সমস্ত প্রাণিকূল একটু শীতল পানি ও ছায়ার জন্য কাতর হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে কখনো হঠাত শুরু হয় কালবোশের দুরস্ত তাঞ্চ। তেওঞ্চুরে সবকিছু তচ্ছন্দ করে দিয়ে যায়। তবে গ্রীষ্ম শুধু পোড়ায় না, অকৃপণ হাতে দান করে আম, জাম, জামুল, লিচু, তরমুজ ও নারকেলের মতো অমৃত ফল।

বর্ষাকাল : গ্রীষ্মের পরেই মহাসমারোহে বর্ষা আসে। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। দিঘিজয়ী যোদ্ধার বেশে বর্ষার আবির্ভাব। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি খেমে থেমে শিউরে ওঠে। শুরু হয় মুষলধারায় বৃক্ষ। মাঠ-ঘাট পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতিতে দেখা দেয় মনোরম সজীবতা। জনজীবনে ফিরে আসে প্রশান্তি। কৃষকেরা জমিতে ধান-পাটের বীজ রোপণ করে। গাছে গাছে ফোটে কদম, কেয়া, জঁই। বর্ষায় পাওয়া যায় আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল।

শরৎকাল : বাতাসে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে শরৎ। ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। এ সময় বর্ষার কালো মেঘ সাদা হয়ে স্বচ্ছ নীল আকাশে তুলোর মতো তেসে বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে বসে সাদা কাশফুলের মেলা। বিকেল বেলা মালা গেঁথে উড়ে চলে সাদা বকের সারি। সবুজ টেউয়ের দেলায় দুলে ওঠে ধানের খেত। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে অজস্র তারার মেলা। শাপলার হাসিতে বিলের জল ঝলমল করে।

তাই তো কবি গেয়েছেন—

আজিকে তোমার মধুর মুরাতি

হেরিনু শারদ প্রভাতে ।

হে মাতঃ বঙ্গা, শ্যামল অঙ্গা

ঝলিছে অমল শোভাতে ।

শরতের এই অপরূপ রূপের জন্যই শরৎকে বলা হয় ঝতুর রানি ।

হেমন্তকাল : ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসবের আনন্দ নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্তের। কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। প্রকৃতিতে হেমন্তের রূপ হলুদ। শর্ষে ফুলে ছেয়ে যায় মাঠের বুক। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কৃষক ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফসল কাটার কাজে। সোনালি ধানে কৃষকের গোলা ভরে ওঠে, মুখে ফোটে আনন্দের হাসি। শুরু হয় নবান্নের উৎসব। হেমন্ত আসে নীরবে; আবার শীতের কুয়াশার আড়ালে গোপনে হারিয়ে যায়।

শীতকাল : কুয়াশার চাদর গায়ে উত্তুরে হাওয়ার সাথে আসে শীত। পৌষ-মাঘ দুই মাস শীতকাল। শীত রিক্ততার ঝতু। কনকনে শীতের দাপটে মানুষ ও প্রকৃতি অসহায় হয়ে পড়ে। তবে রকমারি শাক-সবজি, ফল ও ফুলের সমারোহে বিষণ্ণ প্রকৃতি ভরে ওঠে। বাতাসে ভাসে খেজুর রসের দ্বাগ। ক্ষীর, পায়েস আর পিঠা-পুলির উৎসবে মাতোয়ারা হয় গ্রামবাঞ্চা।

বসন্তকাল : সবশেবে বসন্ত আসে রাজবেশে। ফালুন-চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। বসন্ত নিয়ে আসে সবুজের সমারোহ। বাতাসে মৌ মৌ ফুলের সুবাস। গাছে গাছে কোকিল-পাপিয়ার সুমধুর গান। দখিনা বাতাস ঝুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। মানুষের প্রাণে বেজে ওঠে মিলনের সুর। আনন্দে আত্মারা কবি গেয়ে ওঠেন—

আহা আজি এ বসন্তে

এত ফুল ফোটে, এত বাঁশি বাজে

এত পাথি গায় ।

উপসংহার : বাংলাদেশে ষড়ঝতুর এই জীলা অবিরাম চলছে। বিভিন্ন ঝতু প্রকৃতিতে রূপ-রসের বিভিন্ন সম্ভাবনায় আসে। তার প্রভাব পড়ে বাংলার মানুষের মনে। বিচিত্র ষড়ঝতুর প্রভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মন উদার ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

৫.২ বাংলা নববর্ষ

সূচনা : বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে। গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নববর্ষ নিয়ে আসে নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা। বিগত বছরের সব দুঃখ-বেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে যায় নববর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি বাঙালির আনন্দময় উৎসব হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির জাতীয় উৎসব।

বঙ্গাদ বা বাংলা সনের ইতিহাস : বঙ্গাদ বা বাংলা সন প্রচলনের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক। কারও কারও মতে, দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তাঁর নির্দেশে আমির ফতেউজ্জাহ সিরাজি পূর্বে প্রচলিত হিজরি ও চান্দ্র বছরের সমন্বয়ে সৌর বছরের প্রচলন করেন। তবে সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (১০৩ হিজরি) বাংলা সনের প্রচলন হলেও সম্রাট আকবরের সময় (১৬৩ হিজরি) থেকেই এটি সর্বভারতীয় বৃপ্ত লাভ করে। তখন থেকেই এটি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সন আগামর বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ।

নববর্ষের উৎসব : বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকেই নববর্ষ উদ্যাপন করে আসছে। তখন বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। এটি ছিল ফসল কাটার সময়। সরকারি রাজস্ব ও খণ্ড আদায়ের এটিই ছিল যথার্থ সময়। পরে বঙ্গাদ বা বাংলা সনের প্রচলন হলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। আর বাঙালিরা পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন করে। বাংলাদেশে নববর্ষ উদ্যাপনে এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নববর্ষ পালন করা হয়।

পহেলা বৈশাখ : বিগত দিনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার সব হিসেব চুকিয়ে প্রতি বছর আসে পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। মহাধূমধামে শুরু হয় বর্ষবরণ। সবাই গেয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের এই গান :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিঃখাস বায়ে মুরুরুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা— দূর হয়ে যাক।

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলাই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই মেলা। এ মেলায় আবহমান গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিতি ফুটে উঠে। বাটুল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানে মেলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মেলায় পাওয়া যায় মাটির ইঁড়ি, বাসনকোসন, পুতুল; বেত ও ঝাঁশের তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, তালপাখা, কুটির শিল়জাত বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি। এছাড়া চিড়া, মুড়ি, ধৈ, বাতাসাসহ নানা রকমের মিষ্টির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখী মেলায়। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, পহেলা বৈশাখে ভালো খেলে,

নতুন পোশক পরলে সারাটি বছরই তাদের সুখে কাটবে। তাই গ্রামে পহেলা বৈশাখে পাঞ্চা থায় না। যাদের সামর্থ্য আছে তারা নতুন পোশক পরে।

বাংলা নববর্ষের আরেকটি আকর্ষণ হাজারাত। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের দিন তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ শেষ করে নতুন খাতা খোলেন। এ উপলক্ষে তারা নতুন-পুরনো খন্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ান। প্রাচীনকাল থেকে এখনো এ অনুষ্ঠানটি বেশ ঝাঁকজমকভাবে পালিত হয়ে আসছে।

নববর্ষের প্রভাব : আমাদের জীবনে নববর্ষ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। নববর্ষের দিন ছুটি থাকে। পারিবারিকভাবে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বন্ধু-বান্ধব, আতীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সব কিছুতে আনন্দের ছোয়া লাগে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ছেট-বড় সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিয় করে। অতীতের লাভ-ক্ষতি ভুলে গিয়ে এদিন সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বপ্ন বোনে। নববর্ষ আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। তাই আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

নববর্ষের তাংগর্য : বাঙালির নববর্ষের উৎসব নির্মল আনন্দের উৎসধারা। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে এটি আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। নববর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের জীবনবাদী ও কল্যাণধর্মী রূপটিই খুঁজে পাই। আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের নববর্ষ উদ্ঘাপনে আনন্দের বিস্তার আছে, কিন্তু কখনো তা পরিমিতিবোধকে ছাড়িয়ে যায় না। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির সারা বছরের আনন্দের পসরা-বাহক।

উৎসহার : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি আসে সঙ্গীরবে – নিজেকে চিনিয়ে, সবাইকে জানিয়ে। আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে পরিবর্তনের একটা বার্তা নিয়ে আসে নববর্ষ। পুরাতনকে ঘেড়ে ফেলে সে আমাদের জীবনে নতুন হাজারাতার প্রবর্তন করে। নববর্ষ আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে; জাতীয় জীবনে স্বকীয় চেতনা বিকাশে উদ্ভুত করে। মানুষে মানুষে গড়ে তোলে সম্প্রীতির কোমল বন্ধন। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে এত আনন্দ ও গৌরবের।

৫.৩ বিজয় দিবস

সূচনা : আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর সবচেয়ে আনন্দ ও গৌরবের একটি দিন। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই দিনে আমাদের প্রিয় স্বদেশ দখলদারমুক্ত হয়েছিল। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করেছিলাম। এই দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে স্বর্ণীয় দিন। এটি আমাদের ‘বিজয় দিবস’।

বিজয় দিবসের ইতিহাস : বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহানও। প্রতিটি বিজয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের মহান অর্জনের পেছনেও বীর বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আতাদানের

ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালিদের মনে পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছার জাগরণ ঘটে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নানা আদেশনের মাধ্যমে তা প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। অবশেষে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে বৃপ্ত লাভ করে। বাঙালির স্বাধিকারের ন্যায্য দাবিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পশ্চিমা সামরিক জাত্তাবাহিনী বাঙালি-নির্ধনের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাঙালিরা বুখে দাঢ়ায়। গর্জে ওঠে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-শ্রিষ্টান—সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। যার যা আছে তাই নিয়ে বাঁপিয়ে পড়ে দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে। সুনীর্ধ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি সামরিক জল্লাদরা এ সময় গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-ক্ষেত্রে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে নিরাহ জনসাধারণকে। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে। প্রাণ বাঁচাতে সহায়-সম্বলহীন এক কোটি মানুষকে আশ্রয় নিতে হয় প্রতিবেশী দেশ ভারতে। তবু বাঙালি দমে যায় নি। পৃথিবী অবাক তাকিয়ে দেখে :

সাবাস বাংলাদেশ! এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয় :

জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়।

অবশেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশের মুক্তিসেনা ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রক্তাক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। সূচিত হয় বাংলাদেশের মহান বিজয়।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গৌরবময় বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির জয়বাতার শুরু। এই দিনে স্বপরিচয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পাই। এই দিনটির জন্যই সারা বিশ্বে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মর্যাদা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৬ই ডিসেম্বর তাই আমাদের জাতীয় দিবস। প্রতি বছর সবিশেষ মর্যাদা নিয়ে জাতির কাছে হাজির হয় বিজয় দিবস। সব অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস আমাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

বিজয় দিবসের উৎসব : ১৬ই ডিসেম্বর ভোরে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা হয়। বাংলাদেশের আগামর জনসাধারণ মহাসমারোহে বিজয় দিবস পালন করে। ১৫ই ডিসেম্বর রাত থেকেই বিজয় দিবস উদ্যাপনের প্রস্তুতি চলে। দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ, ঘর-বাড়ি, দোকানপাট, রিঝু-গাড়ি ইত্যাদিতে শোভা পায় লাল-সবুজ পতাকা। স্কুল-কলেজ কিংবা রাস্তায় রাস্তায় আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। স্বাধীনতার আনন্দে সব শ্রেণির মানুষ যোগ দেয় এসব অনুষ্ঠানে। কোথাও কোথাও বসে বিজয় মেলা। সরকারিভাবে এদিনটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। ঢাকার

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন কাঙালিভোজের আয়োজন করে থাকে। অনেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিজয় দিবস অরণে অনুষ্ঠান করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানযাত্রা। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের আআর শাস্তি ও দেশের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করা হয়। শহরে সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বিশেষ আলোকসজ্জার। সমগ্র দেশ জুড়ে উৎসববৃত্তির পরিবেশে বিজয় দিবস পালিত হয়।

উপসংহার : এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিনটি শুধুই আমাদের বিজয়ের দিন নয়, বেদনারও দিন। আমাদের চেতনা জাগরণেরও দিন। যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে আমরা এই গৌরবের অধিকার পেয়েছি, তাঁদের সেই আতোঃসর্গের কথা মনে রেখে আমাদেরও সেই চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হতে হবে। দেশ ও জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই বিজয় দিবসের মহিমা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

৫.৪ ট্রেনে ভ্রমণ

ভূমিকা : ভ্রমণ সর্বদাই আনন্দের। এই আনন্দের সঙ্গে ভ্রমণে যুক্ত হয় জ্ঞানগাত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

‘বিপুল এ পৃথিবীর কতকুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু ময়ু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।’

প্রকৃতপক্ষে, ভ্রমণের ফলে মানুষের চিন্ত যেমন প্রফুল্ল হয় ঠিক তেমনি সে অনেক অজানার সম্মতি লাভ করে। আমি একদিন ট্রেন-ভ্রমণে বের হই।

ভ্রমণ কী? : ভ্রমণ হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেড়ানো বা পর্যটন। মহানবীর বাণীতে আছে, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সুদূর চীন দেশে যাবার আহ্বান। শ্রীকৃষ্ণও বিশেষ উদ্দেশ্যে মধুরা থেকে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করেছেন। ধর্মীয় মহাপুরুষদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ বা মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন। এ সব কিছুর সঙ্গেই আছে আনন্দ আর জ্ঞানের পিপাসা। ভ্রমণ মানবমনে আনন্দ দান করে এবং জ্ঞানের পিপাসা মেটায়। সে কারণে অনেকে এটি কর্তব্যকর্ম বলেও মনে করে।

অমগের পথসমূহ : সাধারণত স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ এই তিনি পথেই অগ্রণ করা যায়। স্থলপথে বাসগ্রামগ, সাইকেল অগ্রণ, মোটরসাইকেল অগ্রণ, টেক্সি অগ্রণ ইত্যাদি হতে পারে। তবে পরিসর বড়, দীর্ঘ পথ ক্লাসিহীনভাবে ভূমগের পক্ষে আরামদায়ক রেলগ্রামগ। এতে পথে অনেক স্টেশন থাকায় নানা স্থানের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে ক্ষণিক দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটে।

ট্রেনে অগের শুরু : পরীক্ষা শেষে তখন আমার স্কুল বৃক্ষ। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে মা-বাবার সঙ্গে সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে পৌছি। সঙ্গে আমার বোন মাত্রা। উদ্দেশ্য গ্রামের বাড়ি শেরপুরে যাব। আমার বাবা আগেই ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রেখেছিলেন। আমরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের ‘সুলভ’ শ্রেণিতে নির্ধারিত আসনে বসলাম। ট্রেনের নাম ‘অগ্নিবীণা’। নামটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বই থেকে নেওয়া। সকাল ঠিক নয়টায় ট্রেন কমলাপুর স্টেশন ছাড়ল।

ট্রেনের ভেতরের অবস্থা : বাবা আমাকে বলেছিলেন: ‘সুলভ’ শ্রেণিতে উঠলে বিচিত্র ধরনের মানুষের দেখা মেলে। সত্যি তাই দেখলাম। নিম্নবিভিন্ন, মধ্যবিভিন্ন নানা ধরনের নারী-পুরুষ সেই সঙ্গে শিশুরা আসনে বসেছে। দুজনের আসনে তিনি বা চারজনও কষ্ট করে বসে ছিলেন। একজন বৃক্ষ আসন পান নি। পাশের আসন থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে দিলেন। এরই মধ্যে চানাচুরওয়ালা ‘চানাচুর-বাদাম’ বলে মিহি সুর তুলে, আকর্ষণীয় গল্প ছড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন চোখের সামনে দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে তা পাঠ করায় মনোযোগী ছিলেন। ট্রেন ধীরে ধীরে গতিপ্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন স্টেশন : আমি ইতোমধ্যে জানালার ধারে গিয়ে বসেছি। বোন মাত্রা আমার মুখোমুখি বসে। আমার পাশে বাবা আর মাত্রার পাশে মা বসা। দেখলাম ট্রেন তেজগাঁও, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, জয়দেবপুর ইত্যাদি স্টেশনে ক্ষণিক দাঁড়াল। আর স্টেশনে অপেক্ষমাণ মানুষগুলো জলদি উঠে পড়ল ট্রেন। কারও হাতে ছিল ব্যাগ, কারো কোলে শিশু। কিন্তু সবারই একটাই লক্ষ্য এবং তা হলো ট্রেন। ট্রেনেই উঠেই তাদের সব ব্যস্ততা কমে যায়। যে যার আসন খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে যান।

ট্রেন থেকে : জানালার ধারে বসে আছি। মনে হচ্ছে মাঠ-ঘাট-গাছপালা দৌড়াচ্ছে। আমার চক্কু খিঁর। কয়েকটা পাখি আকাশে পাখা মেলে আমাদের পাশাপাশি চলে আবার পিছিয়ে পড়ে। মনে হয়, সারা পৃথিবী যেন ঘুরছে, আর আমরা স্থির আছি। জানালার ধারে বাতাসের গতিবেগের কারণে আমার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি বাবা বই হাতে, মা চোখ বুজে আছেন। ট্রেন থেকে শূন্য মাঠ দেখা যায়। কিছুদিন আগেও এখানে সোনালি ধান ছিল। একটি বাড়ি দুত চলে যায়। সেখানে গরু আর মোষ বাঁধা ছিল। দূরে একটি ইটের বাড়িও চোখে পড়ে। অনেক টিনের ঘরের চালে সূর্য চিক চিক করে। পুকুরে গ্রামের বৌঝিরা কাজে ব্যস্ত-সেটাও চোখে পড়ে। গ্রাম বাংলার রূপ যে এত সুন্দর তা এর আগে আমার চোখে এভাবে আর ধরা পড়ে নি। কবি লিখেছেন—

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে চাই না আর—”

জীবনানন্দের এই ভাষ্য যে কতটা সত্য, যেদিন ট্রেনে ভ্রমণ করলাম, সেদিন বুবাতে পারলাম।

উল্লেখযোগ্য স্থান : ট্রেনে ভ্রমণে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য স্থান ও স্থাপনার মধ্যে পড়ল কমলাপুর রেলস্টেশন। দীর্ঘতম প্লাটফর্ম আছে এই স্টেশনে। তারপর তেজগাঁও আসার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ে ঢাকার চলচ্চিত্র উল্লয়ন সংস্থা বা এফডিসি। ভাওয়ালের জমির ওপর দিয়ে জয়দেবপুরে যাবার আগেই ঢাকা বিমানবন্দর চোখে পড়ে। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। জামালপুরে যমুনা সার কারখানা ছাড়াও পথে নানা স্থান ও স্থাপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সাইনবোর্ডগুলোর ওপর একটু স্থির দৃষ্টি রাখলে স্থান ও স্থাপনাগুলোর নাম ভালোভাবেই পাঠ করা সম্ভব। ট্রেনে ভ্রমণের সময় নানা স্থান ও বিচিত্র স্থাপনাগুলো আমাকে আকৃষ্ট করে।

শেষ স্টেশন: ট্রেন থেকে নামার আগের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা সবাই যে যাব ব্যাগ হাতে নিলাম। বাবা বড় ব্যাগগুলো এক সঙ্গে রেখে ট্রেন থামার অপেক্ষা করলেন। আমি আমার একপাটি জুতো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাত্রা বলল : শ্রেষ্ঠা দিদি তোমার জুতো আমার সিটের নিচে এসে গেছে। ট্রেন থামতেই লাল শার্ট পরা কুলিরা এলো। বাবা তাদের হাতে ব্যাগ বুঁধিয়ে দিলেন। আমরা নামার চেষ্টায় ব্যস্ত, অনেকে ট্রেনে উঠার চেষ্টায় মন্ত। এ সময় শৃঙ্খলা দরকার। কিন্তু শৃঙ্খলার বড় অভাব। শেষ পর্যন্ত আমরা জামালপুর স্টেশনে নামলাম। আমাদের সাত ঘণ্টার ট্রেনে ভ্রমণ সমাপ্ত হলো।

উপসংহার : ট্রেনে ভ্রমণ না করলে জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে বাষ্পিত হতাম। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয়, নানা স্থান অবলোকন, বিভিন্ন স্থাপনা দর্শন ইত্যাদি আমার মনে নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। সুন্দর শ্যামল বাংলাদেশ আমার মনে দেশপ্রেম জাগায় আরও তীব্রভাবে। ট্রেনে ভ্রমণের এই সাতটি ঘণ্টা আমার কাছে যেন সাত জন্মের অভিজ্ঞতার খণ্ডরূপ।

৫.৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সূচনা : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে পুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের জন্মলাটা থেকে যে শোষণ ও অত্যাচারের শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটে এই যুদ্ধের মাধ্যমে। সমগ্র জাতি দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের চেতনায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল এই যুদ্ধে। ফলে একসাগর রক্তের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি জাতির কাছে স্বর্ণময় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা : ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচার একটি দোতলা ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার আগারগাঁতে শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত। বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত তথ্য, প্রমাণ, বস্তুগত নির্দর্শন, রেকর্ডপত্র ও আরকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে দেশের কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের, সারা যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, ডা. সারওয়ার আলী, রবিউল হুসাইন, আকৃ চৌধুরী ও মফিদুল হক। এদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন আরক, তথ্য-প্রমাণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের সুদৃঢ় তত্ত্বাবধানে।

জাদুঘরের অবকাঠামো : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখেই রয়েছে ‘শিখা চির অন্নান’। তারকা-আকৃতির একটি বেদির ওপর জুলছে অনৰ্বাণ শিখা। তার পেছনে পাথরে খোদাই করা আছে এক দৃঢ় অঙ্গীকার :

সাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি
সাক্ষী আকাশের চন্দ্রতারা
ভুলি নাই শহিদদের কোনো শূতি
ভুলব না কিছুই আমরা।

দোতলা বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্যালারি : নিচ তলায় তিনটি ও দোতলায় তিনটি। প্রথম গ্যালারির নির্দশনগুলো দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। যেমন : সিলেট অঞ্চলে প্রাপ্ত ফসিল, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের মডেল, ভুটান থেকে পাওয়া শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি, বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদের মডেলসহ বিভিন্ন মসজিদের টালির নির্দর্শন এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকাজ। এসবের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নানা সময়ের মুদ্রা, তালপাতার লিপি ও তুলট কাগজে লেখা মনসামঞ্জস কাব্যের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রামের চিত্র। যেমন : নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেখানে পরাজিত হয়েছিলেন সেই পলাশীর আশ্রকাননের মডেল; সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, তিতুমীর, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি; ক্ষুদ্রিম, প্রফুল্ল চাকী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শাওকত আলীর ফটোগ্রাফ। আরও আছে সিপাহি বিদ্রোহের স্থিরচিত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের শহীদদের চিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম সম্মাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার কপি এবং ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের – যাকে আমরা ‘পঞ্চাশের মহস্তর’ বলি, তার করুণ দৃশ্যের ছবি।

দ্বিতীয় গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে পাকিস্তান আমলের ইতিহাস। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪র সাধারণ নির্বাচন, '৫৮ের সামরিক শাসন, '৬২র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬র ছয় দফার আন্দোলন, আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছাস ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, ছবি ও আরক।

তৃতীয় গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ২৫শে মার্চ রাত্রিতে সংঘটিত গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার সংক্রান্ত ছবি ও শরণার্থীদের জীবনচিত্র।

দোতলার তিনটি গ্যালারি সাজানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য, প্রমাণ ও চিত্র দিয়ে। প্রথমটিতে (চতুর্থ গ্যালারি) রয়েছে, পাকবাহিনীর নির্থূরতার বিভিন্ন ছবি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার এবং সেন্টার কমান্ডারদের নামা তৎপরতার তথ্য ও ছবি। পরেরটিতে (পঞ্চম গ্যালারি) আছে প্রতিরোধের লড়াই, গেরিলাযুদ্ধ, নৌ-কমান্ডো, বিমানবাহিনী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন, রাজাকার-দালালদের ভূমিকা এবং সশস্ত্র যুদ্ধের ছবি, আরক ও বিবরণ। সবশেষে (ষষ্ঠ গ্যালারি) রয়েছে গণহত্যা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ বুদ্ধিজীবী, চূড়ান্ত লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্মুখ বিভিন্ন আরক, বিবরণ ও ছবি।

প্রতিটি গ্যালারিতে আছেন একজন চৌকশ গাইড। তিনি দর্শনার্থীদের নামা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদের কোতুহল নিবৃত্ত করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চতুরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানারকম বই, পোস্টার, ক্যাসেট, সিডি, আরকসামগ্ৰী বিক্ৰিৰ জন্য একটি পুস্তকবিপণি, একটি খাবারের দোকান ও একটি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং সামনের অংশে আছে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি চমৎকার অডিটোরিয়াম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম : মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জাদুঘর পরিদর্শনের ক্ষেত্ৰে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন সুবিধাসহ এখানে নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান কৰা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রাচ্চে প্রদর্শনীৰ জন্য একটি গাড়িকে ভার্যাম্যাণ জাদুঘরে রূপান্তরিত কৰা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে ভিডিও প্রদর্শনীৰ মাধ্যমে আমন্ত্রিত দর্শকদেৱ মুক্তিযুদ্ধেৰ বিভিন্ন প্ৰামাণ্যচিত্ৰ দেখানো হয়। উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজন কৰা হয়ে থাকে নানা অনুষ্ঠানেৰ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংগ্ৰহীত আরক সংখ্যা প্ৰায় এগাৰ হাজাৰ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বেৰ আৱাও আটটি দেশেৰ সমভাৱাপন্ন জাদুঘরেৰ সঙ্গে মিলে “ইন্ট’ৱন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্ট’ৱিক মিউজিয়ামস্ অব কনসাল্স” গঠন কৰেছে।

উপসংহার : যেকোনো জাদুঘর দেশেৰ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধৰাৰ মধ্য দিয়ে অতীত এবং বৰ্তমানেৰ মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা কৰে। বাংলাদেশেৰ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘৰ আমাদেৱ মহান মুক্তিযুদ্ধেৰ গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ-আৱাক-দলিলপত্ৰেৰ একমাত্ৰ সংগ্ৰহশালা। আমাদেৱ ভবিষ্যৎ প্ৰজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধেৰ ইতিহাস সঠিকভাৱে জানতে পাৱে, ভুলে না যায়, সে লক্ষ্যেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘৰ প্ৰতিষ্ঠিত ও পৱিচালিত হয়ে আসছে।

৫.৬ আমার ছেগেবেলা

আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, ‘জল পড়ে পাত নড়ে।’ তখন ‘কর খল’ প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে।’ আমার জীবনে এইটোই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুবিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর-একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজান্দি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আচীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি-তামাশা। বাড়িতে নৃতনসমাগম জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত।

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি তাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভূবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রাচিত্রে মন ভারি উৎসর্গ হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোঃসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চক্ষে হইতে পারিত— কিন্তু, বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আচর্য-সূর্যচন্দ্র দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো মৃতি এখনো জাগিয়া আছে; আর মনে পড়ে ‘বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।’ ওই ছড়াটা যে শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে-কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা স্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনীয়ে সত্য স্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি স্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চেঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন স্কুল-পথের অমণ্ডুকান্তিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ত কথাটি বলিয়াছিলেন, “এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।” সেই শিক্ষকের

নামধার্ম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই। কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাখাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর-কোনদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েল্টাল সেমিনারিতে অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অস্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্বিগ্নের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাঞ্ছা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই, সত্য কী কারণে আমাকে তয় দেখাইবার জন্য হঠাতে ‘পুলিশম্যান’ ‘পুলিশম্যান’ করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিশম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অন্তত মোটামুটি রকমের একটা ধরণ আমার ছিল। আমি জানিতাম একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন থাই-কাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিন্দ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমন করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলসৰ্প থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিশকর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায়, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দোড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠাদেশকে কুষ্টিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকর্ষার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু, আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুঁড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাট-ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মাঝের ঘরের ঘরের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের ঝান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

(-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫.৭ বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক কৃষক। কৃষকের অক্সান্ত পরিশ্রমে এ দেশ তরে ওঠে ফসলের সমারোহে। আমরা পাই ক্ষুধার আহার। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রফতানি করে দেশের অর্থনৈতি সমৃদ্ধ হয়। বলতে গেলে, কৃষকই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি; আমাদের জাতির প্রাণ। কবির ভাষায় :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুন্তিকামী, দেশের সে যে আশা।

কৃষকের অভীত ইতিহাস : প্রাচীনকালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল কম, জমি ছিল বেশি। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হতো। তখন শতকরা ৮৫ জনই ছিল কৃষক। তাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা থাকত মাছে। তাদের জীবন ছিল সুস্থী ও সমৃদ্ধ। তারপর এলো বগীর অত্যাচার, ফিরিঙ্গি-পর্তুগিজ জলদসুদের নির্যাতন, ইংরেজদের খাজনা আদায়ের সূর্যাস্ত আইন, শোষণ ও নিপীড়ন। এলো মন্দতর, মহামারী। গ্রাম-বাংলা উজাড় হলো। কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেল। সম্পদশালী কৃষক পরিণত হলো ভূমিহীন চাষিতে। দারিদ্র্য তাকে কোণঠাসা করল। কৃষকের জীবন হয়ে উঠল বেদনাদায়ক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

সকন্দে যত তার চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বৎশ বৎশ ধরি
... শুধু দুটি অন্ন খুটি কোন মতে কষ্ট-ক্লিষ্টপ্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

এভাবেই এককালের সুস্থী ও সমৃদ্ধ কৃষকের গৌরবময় জীবন-ইতিহাস অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বর্তমান অবস্থা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি কৃষকের উদাসতু, অসহায় ও বিষণ্ণ জীবনের কোনো রূপান্তর ঘটে নি। বাংলার কৃষক আজো শিক্ষাহীন, বস্ত্রাহীন, চিকিৎসাহীন জীবন-যাপন করছে। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। জমির উর্বরতাও গেছে কমে। ফলে বাড়তি মানুষের খাদ্য যোগানের শক্তি হারিয়েছে এ দেশের কৃষক। পৃথিবী জুড়ে চাষাবাদ পন্থতির পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক পন্থতিতে উন্নত দেশ কৃষকের শক্তি বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এ দেশে এখনো মানুষাতার আমলের চাষাবাদ ব্যবস্থা বহাল আছে। বাংলার কৃষকও তোতা লাঙল আর কঙ্কালসার দুটো বলদের পেছনে ঘূরতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া অন্বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ - কোনো কিছুই মোকাবেলা করার কোশল ও সামর্থ্য কৃষকের নেই। তবে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পন্থতি প্রয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। সম্প্রতি ব্যাংক, সমবায় সমিতি বা মহাজনের ঝণের টাকায় আর উচ্চ ফলনশীল বীজের সাহায্যে কৃষিতে ফলন বেড়েছে। কিন্তু ক্ষেত্রের ফসল কৃষকের ঘরে উঠার আগেই ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান কিংবা মহাজনের ঝণ পরিশোধ করতে হয়। তাই কৃষকের সুখ-স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হলেও কৃষকের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এখনো তারা নানা রোগ-শোক, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বিদ্যুদ্ধে লড়াই করছে।

কৃষকের উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশীয় অর্থনৈতিতে কৃষির অবদানও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকের উন্নয়ন সাধন করা দরকার। বাংলার কৃষকের ভাগ্যেন্নয়নের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি দরকার চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পন্থতির প্রবর্তন। নিজের জমিতে কৃষক যেন স্বল্পমূল্যে উন্নত

বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পায় তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে কৃষককে সুদমুক্ত খণ প্রদান করতে হবে। আবার কৃষক তার ফসলের যেন ন্যায্য দাম পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সারা বছর কৃষকের কাজ থাকে না। তাই তার অবসর সময়টুকু অর্থপূর্ণ করার জন্য কুটিরশিল্প সম্পর্কে তাকে অগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষকের চিকিৎসিলেন্ডন ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসারও সুবলেদোবস্ত করতে হবে।

উপসংহার : বাংলার কৃষকরাই বাংলালি জাতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি তারা। তবুও কৃষকরা বহুকাল ধরে অবহেলিত। বিশেষ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এখনো নিম্নমানের। এ বিষয়ে আমাদের সকলের সচেতন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কৃষক ও কৃষিকে গুরুত্ব দিলেই আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে। দেশের দায়িত্ব দূর হবে। বাংলার ঘরে ঘরে ফুটে উঠবে স্বাচ্ছন্দের ছবি। বলা যায়, কৃষকের আত্মার ভেতরই লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বীজ।

৫.৮ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজ বিজ্ঞান আমাদের কাছে নিশ্চাস-পশ্চাসের মতোই অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা মুহূর্তও বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এখন যেকোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের অবদান লক্ষণীয়। বলা যায়, এখন বিজ্ঞানই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ন্ত্রক।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। এখন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে সভ্য-মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জীবন-ধারণ করছে। এই যে বসে লিখছি – হাতের কলম ও কালি, লেখার কাগজ, এমনকি বসার জায়গাটিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। আমাদের পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে সব জায়গায়ই বিজ্ঞানের অবদান অসীম। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পায় প্রতিটি কাজেই আমরা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

শহরে জীবনে বিজ্ঞান : শহরে জীবনে মানুষ আর বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শহরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে এলার্মস্টিলির শব্দে। ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরু করি টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ দিয়ে। এরপর আছে সংবাদপত্র। তারপর গ্যাস অথবা হিটার কিংবা স্টোভে তাড়াতাড়ি রান্না করে খাই। রিঙ্গা, অটোরিঙ্গা, বাস, ট্রেন বা মোটরসাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে পৌছাই। সিড়ির বদলে লিফটে উঠে অফিসকক্ষে যাই। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে দূর-দূরান্তে খবর পাঠাই। কম্পিউটারে কাজের বিষয় লিখে

রাখি। ক্লাস্ট দেহটাকে আরাম দেওয়ার জন্য এসি কিংবা ইলেকট্রিক পাথার নিচে বসি – এই ভাবেই সারাদিন বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আবার সম্ম্যায় বাড়ি ফিরে দিনের অবসন্নতা দূর করতে মিউজিক প্লেয়ার কিংবা টিভি চালিয়ে মনটাকে সতেজ রাখতে চেষ্টা করি। ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটারে তাদের নেট রাখে; কখনো কখনো ভিডিও গেমস্ খেলে। এমনিভাবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বিজ্ঞানের অবদান অনুভব করি।

গ্রামীণ জীবনে বিজ্ঞান : যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিময়কর অবদানের জন্য মানুষ আজ দূরকে করেছে নিকট প্রতিবেশী। বাস, রিস্কা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল সবই এখন গ্রামীণ জীবনের অংশ। ফলে বিজ্ঞান শহরজীবনকে অতিক্রম করে পৌছে গেছে গ্রামে। বর্তমানে গ্রাম্য জীবনেও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন, টর্চ, স্লো, সাবান, পাউডার, আয়না-চিরুনি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, ট্রাইট্র ইত্যাদি এখন গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। শহরের মানুষ যেমন নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে বিজ্ঞানকে নিয়সজী করেছে, তেমনি গ্রামের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনেও ইলেকট্রিক হিটার, রান্নার গ্যাস, প্রেসার কুকার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবের অপকারিতা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। যত্নের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে মানুষ পরিশ্রম-বিমুখ হয়ে উঠেছে। মানসিক পরিশ্রমের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম কম করছে। ফলে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের জীবনে কৃত্রিমতা ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতার মতো সদ্বৃণগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বাঢ়ছে। বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রশক্তির ওপর অস্থি আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

উপসহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞান। সকাল থেকে সম্ম্যা, আবার সম্ম্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় তার সবই বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান আজ আমাদের নিত্য সহচর। বিজ্ঞান আমাদের জীবন-যাপনকে করেছে সহজ-সরল। তবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু যে কল্যাণ করছে তা নয়, অনেক ক্ষতিও করছে। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহার না করে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।

৫.৯ ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা : মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন। এ সময় যেভাবে নিজেকে গড়ে তোলা হয়, সারা জীবন সে রকম ফল পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনকে বলা হয় প্রস্তুতির জীবন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হয় এই ছাত্রজীবনেই। সুতরাং বৃহত্তর জীবনের পটভূমিতে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক।

ছাত্রজীবন : কবি সুনির্মল বসু বলেছেন :

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানাভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্রি।

মানুষ সারা জীবন কিছু না কিছু শেখে। তাই বৃহস্তর অর্থে মানুষের গোটা জীবনটাই ছাত্রজীবন। কিন্তু ছাত্রজীবন বলতে আমরা বুঝি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনকে। জীবন গঠনের জন্য মানুষকে একটি বিশেষ সময়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের এই সময়টুকুই মানুষের ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনের লক্ষ্য : ‘ছাত্রনৎ অধ্যয়নৎ তপৎ’ – অধ্যয়নই হচ্ছে ছাত্রদের একমাত্র তপস্য। ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জন। ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে আত্মনিরোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে সুস্থিতাবে পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপরই অর্পিত হবে। সে গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : জ্ঞানার্জনে আত্মনিরোগই একজন ছাত্রের প্রধান কর্তব্য। এজন্য একজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয়। আর এভাবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে তাকে মানব-চরিত্রের নানাবিধি সৎ-গুণাবলি ও অর্জন করতে হয়। যেমন :

১. চরিত্রগঠন : “চরিত্র হচ্ছে মানবজীবনের মুকুট স্বরূপ।” ছাত্রদের একটি প্রধান কাজ হলো চরিত্র গঠন। তাই এ সময় প্রত্যেক ছাত্রেরই সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, পরোপকার, উদারতা, ধৈর্য, সংযম, দেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্গুণ আয়ন্ত করতে হবে। সব রকম অসদ্গুণ ও বদ-অভ্যাস থেকে দূরে থাকাও একজন ছাত্রের অন্যতম কর্তব্য।

২. নিয়মানুবর্তিতা : শৃঙ্খলা ছাড়া মানবজীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এই শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রজীবনেই অর্জন করতে হয়। এ গুণ অর্জনের ওপর তার ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করে।

৩. সময়ানুবর্তিতা : সময়নিষ্ঠা একটি বড় গুণ। যে মানুষ সময়ের মূল্য দিতে জানে না, সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সময়নিষ্ঠার অভ্যাস করতে হবে, সময়ের মূল্য দিতে হবে।

৪. অধ্যবসায় : ছাত্রদের অলসতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী হতে হবে। দেখা যায় অনেক মেধাবী ছাত্রও অলসতার কারণে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়। আবার অনেক কম মেধার ছাত্র শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা আশাতীত সাফল্য অর্জন করে চমক সৃষ্টি করে। তাই ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. খেলাধূলা ও ব্যায়াম : স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর সুস্থ শরীরে বাস করে সুস্থ মন। শরীর সুস্থ না থাকলে নিয়মিত লেখাপড়া হয় না। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ছাত্রদের নিয়মিত খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চা করা খুব জরুরি।

৬. সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ : ছাত্রদের শেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সহ-শিক্ষা কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, চিরাঙ্গন, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদিতেও তাকে অংশ নিতে হবে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব : ছাত্রজীবনের দায়িত্বের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে নিজের জীবনকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, অপরটি হচ্ছে দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। নিজেকে যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই কল্যাণ হয়। ছাত্ররা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্তৃধার, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই দেশের জাতীয় উন্নয়নে সচেতন নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। অতীতে জাতির সংকটকালে ছাত্রসমাজই অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতেও জাতির সংকটে-সমস্যায় ঝাপড়ে পড়ে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার কাজে ছাত্রসমাজকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রত্যেক ছাত্রকেই মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভাই-বোন, আতীয়-স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা, পাঢ়া-প্রতিবেশীদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে। সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে। শিক্ষক ও গুরুজনদের সম্মান করতে হবে। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার সঙ্গে শ্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার : মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গঠিত হয় ছাত্রজীবনে। আবার দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ছাত্রদের উপর। তাই ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রতিটি ছাত্রেরই উচিত। এতে দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং উন্নতি সাধন হয়।

৫.১০ শ্রমের মর্যাদা

সূচনা : কর্মই জীবন। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। ছেট্ট পিপড়ে থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য বদলেছে। এবং বহু বছরের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বলা যায়, মানুষ ও সভ্যতার যাবতীয় অগ্রগতির মূলে রয়েছে পরিশ্রমের অবদান।

শ্রম কী : শ্রমের আতিথানিক অর্থ হচ্ছে মেহনত, দৈহিক খাটুনি। সাধারণত যেকোনো কাজই হলো শ্রম। পরিশ্রম হচ্ছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। পরিশ্রমের দ্বারাই গড়ে উঠেছে বিশ্ব ও মানব-সভ্যতার বিজয়-স্তম্ভ।

শ্রমের শ্রেণিবিভাগ : শ্রম দুই প্রকার : মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম। শিক্ষক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, অফিসের কর্মচারী শ্রেণির মানুষ যে ধরনের শ্রম দিয়ে থাকেন সেটিকে বলে মানসিক শ্রম। আবার কৃষক,

শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, মজুর শ্রেণির মানুষের শ্রম হচ্ছে শারীরিক শ্রম। পেশা বা কাজের ধরন অনুসারে এক এক শ্রেণির মানুষের পরিশ্রম এক এক ধরনের হয়। তবে শ্রম শারীরিক বা মানসিক যা-ই হোক না কেন উভয়ের মিলিত পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতা।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তার এই ভাগ্যকে নির্মাণ করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাই মানবজীবনে পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কর্মবিমুখ অলস মানুষ কোনোদিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া জীবনের উন্নতি কম্বনামাত্র। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে নিরলস পরিশ্রম দরকার। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী হতে হবে। একমাত্র পরিশ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা : মানুষের জন্ম স্মর্টার অধীন, কিন্তু কর্ম মানুষের অধীন। জীবন-ধারণের তাগিদে মানুষ নানা কর্মে নিয়োজিত হয়। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক ছাত্র পড়ান, ডাক্তার চিকিৎসা করেন, বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়। আর্থ-সামাজিক পদর্মর্যাদায় হয়তো সবাই সমান নয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেধা, মনন, ধার্ম ও শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই সকলের শ্রমের প্রতিই আমাদের সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উন্নত বিশ্বে কোনো কাজকেই তুচ্ছ করা হয় না। সমাজের প্রতিটি লোক নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। তাই চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতির মতো দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। তার ফলে আজো সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করি।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি : সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবনসংগ্রামে তারই হয়েছে জয়। কর্মের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোবাঘরূপ। অন্যদিকে শ্রমশীলতাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

উপসংহার : পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়, সভ্যতা বিকাশেরও সহায়ক। মানব-সভ্যতার উন্নতি-অগ্রগতিতে শ্রমের অবদান অনঙ্গীকার্য। আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও সাধনা আমাদের। তাই কোনো প্রকার শ্রম থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। শ্রমের বিজয়-রথে চড়ে আমাদের উন্নত সভ্যতার সিংহদ্বারে পৌছাতে হবে।

৫.১১ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা : মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতুহল। তার এই অনন্ত জিজ্ঞাসা, অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। আর বই সংগৃহীত থাকে পাঠাগারে। পাঠাগার হলো সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির এক বিশাল সংগ্রহশালা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : “এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অঙ্করের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।” পাঠাগারের বইয়ের ভাঙ্গারে সংগ্রহ হয়ে আছে মানবসভ্যতার শত শত বছরের ইতিহাসের হৃদয়-স্পন্দন।

পাঠাগার কী : পাঠাগার বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটি বাড়ি বা ঘর, যেখানে অনেক বই সংগ্রহ ও সংরক্ষিত থাকে। পাঠাগারের শান্তিক প্রতিশব্দ হচ্ছে পুস্তকাগার, গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, পাঠাগারের মধ্যে তেমনি মানুষের হৃদয়ের উথান-পতনের ধ্বনি শোনা যায়। পাঠক এখানে স্পর্শ পায় সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের কল্পের ধ্বনি, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতানের সূর। তাই পাঠাগার বা লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন।

পাঠাগারের ইতিহাস : পাঠাগারের ইতিহাস বেশ পুরনো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অনেককাল আগে থেকেই পাঠাগারের প্রচলন ছিল। তখন মানুষ তার জ্ঞান সংগ্রহ করে রাখত পাথর, পোড়া মাটি, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, ভূর্জপত্র বা চামড়ায়। আর এগুলো সংরক্ষণ করা হতো লেখকের নিজের বাড়িতে, মন্দির-উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে। স্থিতের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন গ্রিসেও পাঠাগার ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। তারতে প্রাচীনকালে পশ্চিমদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ বিহারসহ বিভিন্ন উপাসনালয়, নালকদা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশীলায় সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে ওঠে। এছাড়া আসিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, দামেস্ক, চীন, তিব্বতসহ বহুস্থানে পৃথিবী-বিখ্যাত পাঠাগারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাঠাগারের বিকাশ : আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পাঠাগারের মধ্যে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি, ফ্রান্সের বিব্লিওথিক নার্সিওনাল লাইব্রেরি, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে ঢাকায় ‘কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই লাইব্রেরির সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শতাধিক পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, খুলনার উমেশচন্দ্র মুত্তি গ্রন্থাগার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করে মানুষের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা আরও বেগবান হয়েছে। ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের প্রচলন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠাগারের শ্রেণিবিভাগ : বিশ্বে নানা রকম পাঠাগার রয়েছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত পাঠাগার, পারিবারিক পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, জাতীয় পাঠাগার উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারের পরিসর সীমিত। সাধারণ পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উল্লেখ্য। তাই এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের প্রয়োজনে যে পাঠাগার গড়ে উঠে সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগার। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবেও পাঠাগার স্থাপন করা হয়ে থাকে। এগুলোই জাতীয় পাঠাগার।

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা : মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের ক্লান্ত, বুভুক্ষু মনকে আনন্দ দেয়। তার জ্ঞান প্রসারে ঝুঁটিবোধ জাগ্রত করে। পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে নানা মত ও পথের বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : “লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জ্ঞানগার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।” সমৃদ্ধ পাঠাগার সব ধরনের পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে; মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে অবদান রাখে। বই ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। তাই পাঠাগারের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে গড়ে উঠে। জাতীয় জীবনে তাই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ : “গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠে সহ্যতা যা দেশ গড়া কিংবা রক্ষার কাজে রাখে অঙ্গুল্য অবদান।” বই পড়ার যে আনন্দ মানুষের মনে, তাকে জাগ্রত করে তুলতে আজ সব ধরনের পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

উপসংহার : পাঠাগার মানবসভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস, মানব-হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে পাঠাগার একান্ত অপরিহার্য। স্কুল-কলেজের উপরে পাঠাগারের স্থান। জাতির প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজের মতো দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা আজ অত্যন্ত জরুরি।

৫.১২ কর্মমুখী শিক্ষা

সূচনা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো – উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা – বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিপ্লি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো – সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ট্রি, কাঠমিস্ট্রি, রাজমিস্ট্রি, মৎস্য চাষ, ইঁস-মুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই মানুষকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিক্ষা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের অশিক্ষা ও অপরিকল্পিত পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে প্রায় দেড় কোটি লোক কর্মহীন। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপর্যুক্ত কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তিকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থাকে শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের উপযোগী করে তোলা অনিবার্যতাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন বিনা কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও তোকেশনাল ট্রেনিং ইনসিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস্ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায়

আরও অনেক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেইনিং কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অত্যুক্ত; পলিটেকনিক ইনসিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে বৃপ্তির করা সম্ভব। দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার।

৫.১৩ অধ্যবসায়

সূচনা : ব্যর্থতা কেউ চায় না। সবাই সাফল্য খোঁজে। কিন্তু কেউই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

পারিব না একথাটি বলিও না আর,

কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,

[...]

পার কি না পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। মনীষী ভল্টেয়ারের ভাষায়, ‘প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রহ্য করতে পারবে।’ ডালটন বলেছেন, ‘লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাঢ়া আর কিছু জানি না।’ বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, ‘আমার আবিষ্কার প্রতিভা-প্রসূত নয়, বতু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।’ এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাঢ়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসংশ্লিষ্ট করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ-জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেন নি। ষষ্ঠিবার পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধবার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সোচিকে বাজে কাগজ তেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যান নি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিঙ্কন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট সাক্ষ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রাই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। তাই নির্দিষ্টায় বলা যায়, জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।

৫.১৪ স্বদেশপ্রেম

সূচনা : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মস্থানকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো-জল-হাওয়া, পশু-পাখি-সবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে—

মিছা মণি মুক্তা-হেম
স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রাত্তি নাই আর।

মানুষের এই উপলব্ধি হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ : স্বদেশপ্রেম অর্থ হচ্ছে নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা এবং যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। জন্মভূমির স্বার্থে সর্বস্বত্ত্ব ত্যাগের সাধনাই স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। নিজের দেশকে সবাই ভালোবাসে। মাকে যেমন সবাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, তেমনি স্বদেশের প্রতিও সবার ভালোবাসা সকল স্বার্থের উর্ধ্বে। প্রত্যেক মানুষেরই কথায়, চিন্তায় ও কাজে প্রকাশ পায় স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ। এই বোধ বা চেতনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তাই এডউইন আর্নল্ড বলেছিলেন, ‘জীবনকে ভালোবাসি সত্যি, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।’ সংকৃত শ্ল�কে আছে : “জননী জন্মভূমিক্ষ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি : দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নির্বার আকর্ষণ থেকে জন্ম হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গার আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ-সূর্য-আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কেননা সে জানে, দেশের জন্য ‘নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।’

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেম : ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার উজ্জীবন মন্ত্র দীক্ষিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী :

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্বাসীর স্পন্দন দেখা হোক সফল।

বাঙালির স্বদেশপ্রেম : পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বিদেশি শক্তি প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি সৈর-শাসকের হাতে বাংলা-ভাষার জন্য রফিক, শফিক, সালাম, জবার, বরকতের আআদান দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সঞ্চামে আআদান করেছে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, মা-বোনসহ সাধারণ মানুষ। অকুতোভয় শত-সহস্র এ সৈনিকের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনো এদেশের লক্ষকোটি জনতা দেশের সামান্য ক্ষতির আশঙ্কায় বন্ধুকণ্ঠে গঁজে উঠে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। কেননা বিশ্বের সব মানুষই পৃথিবী নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাই স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে সকলেরই বিশ্বজ্ঞান্ত, মেঝী ও বিশ্ব-মানবতাকে উচ্চকিত করে তুলতে হবে। কারণ বিশ্বজননীর আঁচল-ছায়ায় দেশ জননীর ঠাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্যাই গেয়েছেন—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর – তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা॥

উপসংহার : দেশপ্রেম একটি নিঃস্বার্থ ও নির্ণোভ আত্ম-অনুভূতি। কোনো প্রকার লোভ বা লোভের বশবত্তি হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মজালই একমাত্র কাম্য। দেশের জন্য তাঁরা সর্বস্ব দান করতে পারেন। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবহমানকাল ধরে জাতিকে প্রেরণা যোগায়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, দেশের জন্য মজালজনক কাজে আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তবেই অর্জিত হবে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

সমাপ্ত

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

৮ম-ব্যাকরণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নঘর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য